

তিন-আনা-সংস্করণ "কল্পতরু" গ্রন্থাবলী নং ১৮

ভূদেব

"যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে॥"

"Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime."

বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন, রাজা রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র,
সম্রাট্ পঞ্চম জর্জ্জ প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য প্রণীত

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
কলিকাতা ও ময়মনসিংহ

১৩২৭

মূল্য তিন আনা

কলিকাতা
৬৫নং কলেজ ষ্ট্রীট ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর পুস্তকালয় হইতে
শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত
এবং
১০৭ নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, স্বর্ণপ্রেসে
শ্রীকরুণাময় আচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



ভূদেব

(১)

প্রায় সওয়া শত বৎসর পূর্ব্বে হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌমনামক এক তেজস্বী সৌম্যমূর্ত্তি সাধক ব্রাহ্মণ আসিয়া কলিকাতায় হরীতকী-বাগাননামক স্থানে বাসকরিতে আরম্ভ করেন। তখনও হরীতকী-বাগান কলিকাতার প্রায় শেষ সীমার মধ্যে গণ্য ছিল। লোকজনের তেমন বসতি ছিল না; যুগী, তাঁতী, শুঁড়ি, ডোম প্রভৃতি সাধারণ লোকেরই বাস ছিল।

সার্ব্বভৌম মহাশয়ের পূর্ব্ব নিবাস খানাকুল কৃষ্ণনগরের নিকট-বর্ত্তী নতিবপুর। নানা কারণে ভাইয়েদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইতেছে দেখিয়া তিনি স্ত্রীপুত্রসহ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। হরীতকী বাগানে সামান্য কুঁড়ে ঘর তৈয়ার করিয়া বাস করিতে থাকেন।

ছাত্র পড়ান ও পুরোহিতের কাজ করিয়া সার্ব্বভৌম মহাশয় সংসার চালাইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র বিশ্বনাথ তর্কভূষণও একজন বিশিষ্ট পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

বিশ্বনাথ তর্কভূষণের সুদীর্ঘ দেহ, অতি বিস্তৃত কপাল, দিব্য গৌরকান্তি. অত্যুজ্জ্বল চক্ষু, লাল টুকটুকে পায়ের তল যে দেখিয়াছে সেই ভক্তিতে মাথা নোয়াইয়াছে।

আগুনের মত গুণও কখন চাপা থাকে না, আপনিই প্রকাশিত হইয়া পড়ে। কলিকাতায় আসিবার অল্পকাল পরেই তর্কভূষণ মহাশয়—তখনকার ইংরেজী শিক্ষিত সমাজে এবং ইংরেজদিগের সংস্থাপিত

সভাসমিতিতে বিশেষভাবে আদর পাইলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সহিতও তর্কভূষণ মহাশয়ের বিশেষ আলাপ ছিল।

নতিবপুরে থাকিবার সময়ই তর্কভূষণ মহাশয়ের বিবাহ হয়। তাঁহার স্ত্রীর নাম ব্রহ্মময়ী। কেবল নামে নহে—প্রকৃতিতে এবং রূপেও তিনি জগন্মাতা ব্রহ্মময়ীরই তুল্য ছিলেন।

এই দেবতুল্য বিশ্বনাথ, জগন্মাতা সদৃশী ব্রহ্মময়ী দেবী ভূদেবের পিতা ও মাতা। হরীতকী বাগানের ৩৭ নং বাটীতে, বাঙ্গালা ১২৩১ সনের ৩রা ফাল্গুন, রবিবার ভূদেব ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তর্কভূষণ মহাশয়ের বয়স তখন তেত্রিশ বৎসর। তর্কভূষণ মহাশয় জ্যোতিঃশাস্ত্রেও পরম পণ্ডিত ছিলেন। তিনি রাশি, নক্ষত্র প্রভৃতির বিচার করিয়া পুত্রের নাম রাখিলেন "ভূদেব"।

পিতামহ এবং পিতার ন্যায় ভূদেবও সুরূপ সুদীর্ঘ শরীর পাইয়াছিলেন। কিন্তু বাল্যকালে জ্বর ও পেটের পীড়ায় ভূদেবকে বড়ই ভোগাইয়াছিল। ছেলের রোগ দূর করিবার জন্য মাতা ওঝা দেখাইয়া ঝাড়ফুক করিতেন—নানা দেবদেবীর পূজা দিতেন; আর পিতা তর্কভূষণ মহাশয় কবিরাজ ডাকাইয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতেন।

নিত্য কবিরাজ আসিয়া হাত দেখে—কাগজে মুড়িয়া ঔষধ দেয়। বালক ভূদেব বেশ মনোযোগের সহিত তাহা লক্ষ্য করিতেন আর অবসর কালে খেলার সাথীদিগের সহিতও তিনি চিকিৎসকের খেলা খেলিতেন। তখন বেশ গম্ভীর হইয়া ছেলেদের হাত ধরিতেন, নাড়ী টিপিতেন—তারপর কাগজ বা পাতায় মুড়িয়া যাহা হাতের কাছে পাইতেন তাহাই ঔষধ দিতেন।

নিজে বহুদিন রোগ ভোগ করায়—বাল্যকাল হইতেই রোগীর শুশ্রূষা ও চিকিৎসা ব্যাপারে ভূদেবের মন আকৃষ্ট হইতে থাকে।

ফলে তিনি জীবনকালে বিশেষ আগ্রহ ও একাগ্রতার সহিত রোগীর সেবা ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

ভূদেবের বয়স বাড়িতে লাগিল। শিশু নাতিটী পাইয়া পিতামহ হরিনারায়ণ সার্ব্বভৌমের আনন্দের আর সীমা ছিল না। তিনি সকল রকমে নাতির সহচর হইয়াছিলেন। পিতা তর্কভূষণও শিশু পুত্রটীকে লইয়া নানা শিশুসুলভ খেলায় মাতিতেন। এইরূপে শিশু ভূদেব পিতামহ ও পিতার সহিত খেলা খেলিতে খেলিতে নানা প্রকার শিক্ষায়ও শিক্ষিত হইতে লাগিলেন।

ভূদেবের মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী অতিশয় ধর্ম্মপরায়ণা, দেবদ্বিজে ভক্তিমতী ও অত্যন্ত কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন। সন্তানের মঙ্গলের প্রতি যেমন তাঁহার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ ছিল, সর্ব্বপ্রকার সুশিক্ষায়ও তাঁহার তেমনি বিশেষ লক্ষ্য ছিল। ছেলের নৈতিক চরিত্র যাহাতে সুদৃঢ় ও উজ্জ্বল হয়, এবং হিন্দুর শাস্ত্র ও সমাজের প্রতি যাহাতে সন্তান ভক্তিমান হয় সেজন্য ব্রহ্মময়ী দেবী সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতেন। ইহার ফলে ভূদেব মাতাপিতৃভক্ত, শাস্ত্র ও সদাচার-পরায়ণ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ ও পরম হিন্দু হইয়াছিলেন।

ভূদেবের বয়স যখন তিন কি চারি বৎসর, তখন একদিন খেলা করিতে করিতে ভূদেব, তর্কভূষণ মহাশয়ের চটিজুতা পায়ে দিয়াছিল। ভূদেবের মাতা ব্রহ্মময়ী দেবী তাহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ জুতা যোড়াটী খুলিয়া লইলেন। নিজে বারংবার পরমারাধ্য স্বামীর জুতা যোড়ার উপর প্রণাম করিলেন এবং ভূদেবকে দিয়াও প্রণাম করাইলেন। পূজনীয়গণের পাদুকাগুলিও যে সম্মানের জিনিষ—এই ঘটনা হইতে শিশু তাহা শিখিয়া লইল।

হরীতকী বাগানে তখন অনেক ডোম বাস করিত। একদিন শিশু ভূদেব একটী ডোমের ছেলের সহিত খেলিতে খেলিতে তাহাদের কুঁড়ের কাছে গেল। ডোমের ছেলেটী তখনই বড় আনন্দে তাহার মাকে

ডাকিল "গু-খেকোর বেটী এদিকে আয়।" ডোম বালকটীর মা ইহা শুনিয়া হাসিতে হাসিতে কুটীরের বাহিরে আসিল—পুত্রকে আদর করিতে লাগিল।

শিশু ভূদেব ইহা দেখিয়া মনে করিল যে, তবে ঐ কথাটা খুব ভাল, তাহা না হইলে বালককে তাহার মা আদর করিল কেন? এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া ভূদেবও বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া মাকে ডাকিল "গু-খেকোর বেটী এদিকে আয়।" ব্রহ্মময়ী দেবী শিশুর মুখে এহেন কথা শুনিয়া রাগে ও দুঃখে ভূদেবকে যথারীতি মারিলেন—কত না আক্ষেপ করিলেন! ভূদেব মায়ের আচরণ দেখিয়া বিস্ময়ে ডুবিয়া গেল! বুঝিল যে, যার তার কথা ভাল নহে—যার তার কাজের অনুকরণ করাও ভাল নহে। তদবধি ভূদেব সর্ব্বদা যে কথা বলিলে কিংবা যেরূপ কাজ করিলে মা, বাবা ও ঠাকুরদাদা প্রভৃতি খুসী হন—তেমনি কথা বলিতে ও কাজ করিতে অভ্যাস করিল।

বালক যাহাতে সর্ব্বপ্রকারে শিক্ষিত ও সাধু হইতে পারে—তর্কভূষণ মহাশয় ও ব্রহ্মময়ী দেবী সর্ব্বদা সে বিষয়ে চেষ্টা করিতেন। নিজেরা কথায় ও কাজে শিশুর সম্মুখে সেই আদর্শই উপস্থিত করিতেন। স্নেহময় মাতাপিতার সেই কামনা ভাবী কালে সম্পূর্ণ সফল হইয়াছিল।

(২)

তর্কভূষণ মহাশয়ের সংসারের সকল কার্য্যই সম্পূর্ণ শাস্ত্রবিধিমতে সম্পন্ন হইত। সুতরাং শাস্ত্রমত বয়স হইলে ঠাকুরদাদা হরিনারায়ণের কাছে ভূদেবের হাতেখড়ি হইল এবং তখন হইতেই স্কুল পাঠশালে না পাঠাইয়া

বাটিতেই বাংলা এবং সংস্কৃত শিখানো হইতে লাগিল। এইরূপে কিছু দূর পর্য্যন্ত বাংলা পড়িয়া এবং সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিয়া নয় বৎসর বয়স হইলে ভূদেবকে সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। সেই সময়ে দেশপূজ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং তাঁহার ভ্রাতাও সেই কালেজে পাঠ করিতেন।

সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হইয়া ভূদেব এমন মনোযোগ ও অধ্যবসায়ের সহিত পড়াশুনা করিতে লাগিল যে, তাঁহার শ্রেণীর অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণ তাহার গুণে মোহিত হইয়া ভূদেবকে আপন সন্তানের মত ভাল বাসিতে আরম্ভ করিলেন।

ভরতশিরোমণি প্রভৃতি সংস্কৃত কালেজের তখনকার দেশবিখ্যাত অধ্যাপকগণের সহিত ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয়ের অত্যন্ত বন্ধুত্ব ছিল। এই বন্ধুত্ব উপলক্ষে ঐ সকল অধ্যাপক প্রায়ই তাঁহাদের বাটীতে আসিতেন এবং যখনই আসিতেন, তখনই ভূদেবকে সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষা করিতেন। ভূদেবও প্রত্যেক পরীক্ষাতেই চমৎকার ফল দেখাইতেন। ইহা দেখিয়া পুত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পিতার যেমন আশ্বাস জন্মিল—অধ্যাপকগণও তেমনি সকলেই একবাক্যে কহিতে লাগিলেন—

"ভূদেব কালে দেশ-বিখ্যাত অধ্যাপক হইয়া তোমার নাম রাখিবে, তর্কভূষণ।"

এই সময়ে সংস্কৃত কালেজে উলাষ্টোন নামে একজন সাহেব এবং আরো জন দুই বাঙ্গালী—ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন। কালেজের নিয়ম ছিল যে—কোন ছাত্র ইংরাজী পড়িতে ইচ্ছা করিলে, প্রত্যহ দুই ঘণ্টা করিয়া তাঁহাদের ক্লাশে গিয়া পড়িয়া আসিতে পারিবে। সংস্কৃত কালেজের জনকতক শিক্ষাভিলাষী ছাত্রও ওইরূপ সুযোগ পাইয়া তাঁহাদের কাছে গিয়া ইংরাজী শিখিত।

ভূদেবের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর চেহারা দেখিয়া সকলেরই তাহার উপরে নজর পড়িত। সংস্কৃত কালেজে ভর্ত্তি হইবার দিন হইতেই উলাষ্টোন সাহেবেরও তাহার উপর নজর পড়িয়া একটু ভালবাসা জন্মিয়াছিল। তিনি একদিন ভূদেবকে আপনার ঘরে ডাকিয়া লইয়া—আদর করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি আমার কাছে ইংরাজী পড়িবে? আমি খুব যত্ন করিয়া তোমাকে ভালরকম ইংরাজী শিখাইয়া দিব।"

সাহেবের মিষ্ট ব্যবহারে এবং যত্ন আদরে ভূদেবের মন ভুলিয়া গেল, তিনি সম্মত হইয়া পরের দিন হইতেই তাঁহার কাছে গোপনে ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিয়া দিলেন—বাড়ীর কেহই এসম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। সাহেব নিজে তাঁহাকে কাগজ কলম এবং ইংরাজী বই সকল দিয়া পড়াইতেন, বাড়ী যাইবার সময়ে ভূদেব সে সকল সাহেবের ঘরেই রাখিয়া যাইতেন। সুতরাং অন্য কেহই তাঁহার ইংরাজী পড়ার বিষয় জানিতে পারিলেন না।

এইরূপে বছর খানেক লুকাইয়া সাহেবের কাছে পড়িয়া ভূদেব তিনখানি রীডার শেষ করিয়া ফেলিলেন এবং হাতের লেখাও অনেকটা সুন্দর করিয়া লইলেন। বালকের শক্তি, চেষ্টা, মনোযোগ এবং আগ্রহ দেখিয়া সাহেবও অবাক হইলেন এবং তাঁহাকে ক্রমে কৃতবিদ্য করিয়া তুলিতে ইচ্ছা করিলেন। এই সময়ে এক ঘটনা ঘটিয়া ভূদেবের সংস্কৃত কালেজের পড়া শেষ হইল।

ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করিলেও সংস্কৃতের উপর ভূদেবের অনুরাগ কমিয়া যায় নাই—তিনি ইংরাজী পড়িয়াও অসীম অধ্যবসায়ের বলে পূর্ব্বের মতই বিশেষ মনোযোগ, পরিশ্রম এবং আগ্রহের সহিত সংস্কৃত পড়িতেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক হরনাথ তর্কভূষণের দোষে ক্রমে সংস্কৃতের উপর হইতে—শুধু ভূদেব বলিয়া নহে—সেই ক্লাশের সকল ছাত্রেরই অনুরাগ ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইতে লাগিল।

অধ্যাপক মহাশয় ইদানীং আর ক্লাশে মোটেই পড়াইবার দিকে মনোযোগ দিতেন না। ছেলেদের প্রত্যহ নূতন নূতন পড়া বলিয়া দিতেন; কিন্তু ছেলেরা শিখিল কিনা তাহার খোঁজ করিতেন না। কেহ পড়া না করিলেত খোঁজ লইতেনই না, ভুলিয়া গেলেও বলিয়া দেওয়া দূরে থাকুক—কথাও গ্রাহ্য করিতেন না। এখন তাঁহার ক্লাশে সংস্কৃত ব্যাকরণ পড়িবার সময়ে কোন কোন বালক যে উহা ছাড়িয়া ইংরাজী পড়িতে যাইতেছে—ইহা দেখিয়াও একটিও কথা বলিতেন না।

অধ্যাপকের এইরূপ অবহেলার জন্য তাঁহার শ্রেণীর সমস্ত বালকই—নূতন তো আর কিছু শিখিতে পারিলই না—বরং পুরাতন যা কিছু শিক্ষা করিয়াছিল সে সমস্তও চর্চ্চার অভাবে ভুলিয়া যাইতে লাগিল। অথচ তিনি সে সব গ্রাহ্যই করিলেন না, কোন মতে ক্লাশে হাজিরা দিয়া চাকরি টুকু বজায় রাখিয়া যাইতে লাগিলেন।

এদিকে উলাষ্টোন সাহেব সেই সময়ে পরম যত্ন ও আদরের সহিত ইংরাজী শিক্ষা দিতেছিলেন। তাঁহার শিক্ষা দিবার সুপ্রণালীতে এবং সহৃদয় ব্যবহারে বালকেরা যেমন অতি সহজে এবং শীঘ্র ইংরাজী শিখিতে লাগিল—অন্য দিকে তেমনি অধ্যাপক হরনাথের অযত্নে তাঁহার উপর হইতে শ্রদ্ধা কমিয়া, সকলেরই সাহেবের উপর ভক্তি-শ্রদ্ধা ও আকর্ষণ জন্মিতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত শিক্ষার উপর অনুরাগ কমিয়া ইংরাজী শিখিবার ইচ্ছা প্রবল হইতে লাগিল।

ভূদেবের পিতা সেই সময়ে তীর্থ-ভ্রমণে গিয়াছিলেন, সুতরাং পিতার ভয়ে তিনি যে বাড়ীতেই আপনাআপনি পড়া করিয়া লইবেন, সে ভয়ও ছিল না। কাজেই ভূদেব সংস্কৃত রাখিয়া কেবল ইংরাজীই শিখিতে লাগিলেন। তাহার ফলে সংস্কৃত যত দূর শিখিয়াছিলেন সে সব অনেক ভুলিয়া গেলেন এবং কালেজের অধ্যাপকেরও দৃষ্টি নাই বলিয়া সে সকল আবার শিখিয়া লইতে মনও গেল না। নহিলে গৃহে

পিতা কর্তৃক পরীক্ষা লইবার ভয় থাকিলে, বালক সে সকল পুনরায় উত্তমরূপ আবৃত্তি করিয়া রাখিতে ত্রুটি করিত না।

সেই সময়ে হঠাৎ একদিন বিশ্বনাথের অধ্যাপক রামচরণ শিরোমণি মহাশয় তাঁহাদের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইনি আরও দুই একবার এখানে আসিয়াছিলেন এবং প্রতিবারেই ভূদেবের সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষা লইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া গিয়াছিলেন।

এবারে আসিয়াও তিনি ভূদেবের সংস্কৃত ব্যাকরণের পরীক্ষা লইতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু ভূদেব এবার বিস্তর ভুল করিতে লাগিলেন। দেখিয়া তিনি যেমন আশ্চর্য্য হইলেন, স্বয়ং ভূদেবও তেমনি লজ্জিত হইয়া বলিলেন—

"আপনি আজ মাপ করুন, আজ আর কোন প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিবেন না। আজ রাত্রে আমি পুস্তকখানা ভাল করিয়া দেখিয়া লই। কাল জিজ্ঞাসা করিবেন—তাহা হইলে বলিতে পারিব।"

ঠিক এই সময়ে ঘটনাচক্রে ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন এবং নিজ অধ্যাপক শিরোমণি মহাশয়কে দেখিয়া ভক্তি ও আনন্দভরে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইলেন।

শিরোমণি মহাশয়ের আর দেরি সহিল না, তিনি বেশী রকম আত্মীয়তা জানাইবার জন্য তৎক্ষণাৎ শিষ্য বিশ্বনাথকে কহিলেন "ওহে তর্কভূষণ, ছেলেটি যে একেবারে নিরেট রাখাল হয়ে গেল দেখ্‌ছি—সব খেয়ে বসে আছে।"

শুনিয়া বিশ্বনাথের হঠাৎ অত্যন্ত বিরক্তি জন্মিল এবং আর দ্বিতীয় কথা না বলিয়া তৎক্ষণাৎ পুত্রের পরীক্ষা লইতে বসিলেন। স্বয়ং শিরোমণি মহাশয়ও নীরব থাকিতে পারিলেন না, শিষ্যের সঙ্গে যোগ দিয়া টিপ্পনী কাটিয়া তাঁহার রাগ আরও বাড়াইয়া তুলিতে লাগিলেন।

ভয়ে ভূদেবের বুকের ভিতর থর থর করিয়া কাঁপিতেছিল, মুখ শুকাইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে শিরোমণি মহাশয়ের কাছে যদি বা দুই একটা বলিতে পারিয়াছিলেন এক্ষণে আর তাহাও পারিলেন না। তাহা দেখিয়া নিদারুণ রাগের বশে বিশ্বনাথ পুত্রকে এমন প্রহার করিলেন যে, প্রতিবাসীরা ছুটিয়া আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ক্ষান্ত করিতে বাধ্য হইল।

যাহা হউক, পরের দিন তিনি তাঁহার দুর্জ্জয় ক্রোধের জন্য মনে মনে নিতান্ত অনুতপ্ত ও লজ্জিত হইয়া আপনি বই খুলিয়া ভূদেবের সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন—'পড়।'

কিন্তু শিরোমণি মহাশয় যে, তাহাকে বইখানি একবার পড়িয়া লইবার সময় না দিয়াই—বিশ্বনাথকে বলিয়া দিয়া এরূপ প্রহার খাওয়াইলেন, তাহাতে তাঁহার উপর বালকের অত্যন্ত ক্রোধ হইল, ভাবিলেন—'সংস্কৃত শিখিয়া লোকে এমনই নিষ্ঠুর হইয়া উঠে।' আর সঙ্গে সঙ্গে অমনি সাহেবের আদর-যত্ন ভালবাসার কথাও মনে পড়িয়া গেল, তখন তিনি সংস্কৃত আর পড়িবেন না ঠিক করিলেন। পিতাকে কহিলেন যে আর সংস্কৃত পড়িবেন না—ইংরাজী পড়িবেন।

বিশ্বনাথ জানিতেন না যে, পুত্র ইংরাজী শিখিতেছে, সুতরাং অগ্রাহ্য করিয়া কহিলেন—"যে মাতৃভাষাই শিখিতে পারে না, সে আবার বিদেশী ইংরাজী ভাষা শিখিবে?"

তখন ভূদেব তাঁহার ইংরাজী পড়ার কিছু কিছু পরিচয় দিয়া আবার কহিলেন যে, তিনি ইংরাজীই পড়িবেন। শুনিয়া বিশ্বনাথ আর বাধা দিলেন না। তিনি মানবের প্রকৃত মনের কথা উত্তমরূপে টের পাইতেন এবং কোন্ পথে কি ভাবে চালাইলে যে শিশু ভবিষ্যতে উন্নতি করিয়া মানুষ হইতে পারিবে, তাহাও বুঝিতে পারিতেন। সুতরাং বালকের ইচ্ছা-স্রোতে বাধা না দিয়া বরং উৎসাহ দানে সাহায্যই করিলেন, কহিলেন ;—

"বেশ, যদি তাই তোমার ইচ্ছা. তবে আর দেরী করিয়া দরকার নাই—আজই চল ইংরাজী স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আসি।"

সেই দিন হইতে সংস্কৃত কালেজ ছাড়িয়া ভূদেব, মহাত্মা রামমোহন রায়ের স্থাপিত "ইণ্ডিয়ান্ একাডেমি" নামক স্কুলে ভর্ত্তি হইলেন। রামমোহন রায় তখন ওই স্কুলের সমস্ত ভার বাবু পূর্ণচন্দ্র মিত্রের উপর দিয়া বিলাত চলিয়া গিয়াছিলেন।

(৩)

সেই সময়ে কলিকাতায় প্রায়ই নূতন নূতন ছোট, বড়, ইংরাজী স্কুল সকল স্থাপিত হইতেছিল এবং সেই সব স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষগণ সর্ব্বদাই অন্য স্কুল হইতে ছেলে ভাঙ্গাইয়া নিজের নিজের স্কুলে ভর্ত্তি করিবার চেষ্টা করিতেন। এই কার্য্যে তাঁহারা এমন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন যে—স্কুল দাঁড় করাইবার জন্য প্রথম প্রথম ছাত্রদের বেতন পর্য্যন্ত লইতেন না।

ভূদেব ভাল ছেলে, উলাষ্টোন সাহেব তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন, সুতরাং তাঁহাকে ভাঙ্গাইয়া নিজের স্কুলে আনিবার জন্য অনেক নূতন স্কুলের কর্ত্তৃপক্ষ মনে মনে মতলব আঁটিতে লাগিলেন।

এদিকে ভূদেব ইণ্ডিয়ান্ একাডেমিতে ভর্ত্তি হইলে উলাষ্টোন সাহেবের আর তাঁহাকে পড়াইবার সুবিধা হইল না। তখন সাহেব, ভূবেদকে—বিবি উইলসন নামক একজন মেমের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়া পড়াইতে বলিয়া দিলেন।

বিবি উইলসন হরীতকী বাগানের কাছে হেদুয়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে থাকিতেন, সুতরাং নিকট হইল বলিয়া মেম সাহেবের কাছে ভূদেবেরও পড়িবার সুবিধা হইল। তিনি প্রত্যহ যথানিয়মে উইলসনের

কাছে গিয়া পড়িতে লাগিলেন। তাহার ফলে ভূদেব এত শীঘ্র—এমন উত্তমরূপে (তাঁহার স্কুলের চেয়ে এমন ঢের বেশী) ইংরাজী শিখিতে লাগিলেন যে, স্কুলের পড়া তো তাঁহাকে দেখিতেই হইত না—বরং ক্লাশের ছেলেদিগকে তিনি পড়া বলিয়া শিখাইয়া দিতে লাগিলেন।

বছরখানেক ইণ্ডিয়ান্ একাডেমিতে পড়ার পর, একদিন ভূদেব সম্পূর্ণ বিনাদোষে—মিছামিছি মাষ্টারের মার খাইয়া ক্রোধে সে স্কুল ছাড়িয়া দিলেন। সেই সময়ে উক্ত ইণ্ডিয়ান্ একাডেমির দ্বিতীয় শিক্ষক নবীনমাধববাবু ঝগড়া করিয়া বাহির হইয়া আসিয়া নিজে একটি 'ফ্রি স্কুল' স্থাপন করিতেছিলেন। তিনি ভূদেবকে পাইয়া—অমূল্য রত্নের মত—একেবারে যেন লুফিয়া লইলেন এবং পরম উৎসাহে তাঁহার নিজের স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া লইয়া পড়াইতে লাগিলেন।

ভূদেব যখনই যে স্কুলে পড়িতেন, সর্ব্বত্রই প্রতিদিন সকল ছাত্রের উপরে থাকিতেন, একদিনের জন্যও কেহ তাঁহাকে ফার্ষ্ট হইতে সেকেণ্ড নামাইতে পারিত না। ক্লাশে ফার্ষ্ট হওয়া যেন তাঁহার একেবারেই মৌরশীপাট্টা হইয়া গিয়াছিল। নবীনমাধবের স্কুলেও তাহার অন্যথা হইল না।

এই স্কুলে বাৎসরিক পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইয়া ভূদেব 'ফার্ষ্ট প্রাইজ' পাইলেন। কিন্তু সেই উপলক্ষ্যে যে ঘটনা ঘটিল তাহা হইতেই সকলে বুঝিতে পারিবেন যে, সেই বাল্যকাল হইতেই ভূদেবের চরিত্র কিরূপ উচ্চ আদর্শে গঠিত হইয়া উঠিতেছিল।

হরীতকীবাগানের বাটীতে ভূদেবের ছোট কাকার 'ছিরু' নামে এক শ্যালক থাকিত। এই ছিরু ভূদেবের সঙ্গে একই স্কুলে একই ক্লাশে পড়িত। কিন্তু ছিরুর মত দুষ্ট বকা ছেলে সমস্ত স্কুলের মধ্যে আর দুইটি ছিল না। পড়াশুনার সঙ্গে তো তাহার সম্বন্ধই

ছিল না, বরং বকামি এবং দুষ্টামিতে সে একেবারে প্রথম নম্বরের বলিয়া চারিদিকে কথা রাষ্ট্র হইয়া গিয়াছিল।

প্রাইজ লইয়া ভূদেব যখন অত্যন্ত আনন্দিতমনে গৃহে ফিরিতেছিলেন, তখন পথে ছিরু তাঁহাকে ধরিয়া কহিল—"দেখ ভূদেব, তুই বাড়ীর ছেলে, তুই যদি প্রাইজ না পাস, তো কেউ কিছু করিতে পারিবে না, বড় জোর না হয় একটু বকুনী খাবি। কিন্তু আমি পরের ছেলে, আমি পড়াশুনা করিতে পারি না বলিয়া হয়তো রাগ করিয়া তাড়াইয়া দিতেও পারে!"

ভূদেব অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা আমি কি করিব মামা, কিসে তোমার উপকার হয় বল?"

ছিরু তৎক্ষণাৎ বলিল—"তোর প্রাইজ বইগুলি আমাকে দিয়া দে—আমি গিয়া বলিব যে, এই দেখ আমি ফার্ষ্ট প্রাইজ পাইয়াছি।"

"কিন্তু এতে যে আমার নাম লেখা কাগজ মারিয়া দিয়াছে।"

"হলোইবা, তুই যদি দিস্‌তো দেখ্‌না আমি সে সব ঠিক করিয়া লইতেছি।"

ভূদেব তৎক্ষণাৎ অত আদরের এবং গৌরবের বস্তুগুলি সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থভাবে আনন্দের সহিত মামাকে দিয়া দিলেন। ছিরু তৎক্ষণাৎ ভূদেবের নাম লেখা সাদা কাগজ খানা জলে ভিজাইয়া তুলিয়া ফেলিয়া, একটা দোকান হইতে আর একখানা সাদা কাগজ লইয়া—ঠিক তেমনি করিয়া নিজের নাম বসাইয়া দিল, তারপর সেখানা বইয়ের উপরে আঁটিয়া দিয়া বাড়ীতে গিয়া খুব আনন্দের সহিত দেখাইয়া বলিল—"এই দেখ, আমি একজামিনে ফার্ষ্ট হয়ে এই প্রাইজ পেয়েছি।"

তখন ভূদেবের পিতামাতা এবং আত্মীয়স্বজন সকলেই ভূদেবকে নিন্দা করিয়া যথেষ্ট বকিলেন এবং ছিরুর মত বালক ফার্ষ্ট হইল আর ভূদেব কিছু পারিল না বলিয়া তাহাকে শাসন করিতেও ত্রুটি

করিলেন না। কিন্তু মহনীয়-চরিত্র বালক নীরবে সেই মিথ্যা অপমান, অনুযোগ এবং সমস্ত শাসন সহ্য করিলেন—কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

কিন্তু যাহা মিথ্যা—তাহা ধরা পড়িতে বাকী থাকে না। মাস কতক পরেই ভূদেবের বাপ খুড়া—তাঁহার স্কুলের শিক্ষকের মুখেই শুনিলেন যে, ভূদেবের মত ছেলে সমস্ত ইস্কুলের মধ্যে আর দ্বিতীয় নাই। সে ত ক্লাশে প্রত্যহই প্রথম থাকে, তাহা ছাড়া এবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় সকলের উপরে ঢের বেশী নম্বর পাইয়া অত্যন্ত গৌরবের সহিত সর্ব্বোচ্চ (ফার্ষ্ট) প্রাইজ পাইয়াছে। আর তাঁহাদের বাটীর ছিরুটা এমনি বদমাইস অপদার্থ যে একজামিনে পাশ হওয়ার নম্বর পর্য্যন্ত রাখিতে পারে নাই।

শুনিয়া আসল ব্যাপার বুঝিতে আর বিশ্বনাথের বাকী রহিল না। পুত্রের এরূপ মহত্ত্ব দেখিয়া তিনি যেমন আনন্দিত হইলেন, তেমনি আপনাদিগকে মহাসৌভাগ্যবান ভাবিতে লাগিলেন। কিন্তু ভূদেবের সম্মুখে আর কোন কথা প্রকাশ করিলেন না।

এই প্রাইজের কাণ্ডের পর হইতে ভূদেব আর সে স্কুলে রহিলেন না। মধু চক্রবর্ত্তী নামক এক ব্যক্তি এক নূতন স্কুল করিয়া তাঁহাকে অনেক প্রকার প্রলোভন দেখাইয়া আপন স্কুলে লইয়া গেল। কিন্তু যে ইচ্ছা করিয়া ভূদেব নবীনমাধবের স্কুল ছাড়িলেন তাহা পূর্ণ হইল না দেখিয়া তিনি সেখানে আর বেশী দিন রহিলেন না—মাস পাঁচ ছয় পরে সে স্কুল ছাড়িলেন।

তর্কভূষণ মহাশয় দেখিলেন যে ক্রমাগত এইরূপ স্কুল বদল করিলে ছেলের লেখাপড়ায় অত্যন্ত ব্যাঘাত ঘটে, সুতরাং কোন মতে তাঁহাকে হিন্দু কালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইবার ইচ্ছা করিলেন।

হিন্দু কালেজের মাসিক বেতন পাঁচ টাকা। ছেলেকে সেখানে পড়াইবার জন্য বৎসরে বৎসরে এইরূপ ষাট্ টাকা করিয়া ব্যয় করা যদিও

তাঁহার মত দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের অতিশয় কষ্টকর, তার উপর পুস্তক প্রভৃতির ব্যয়ও আছে, বিশ্বনাথ কিন্তু তবু নিরস্ত হইলেন না, বা কাহারও কাছে সেজন্য কোন প্রকার অনুগ্রহ বা সাহায্যও ভিক্ষা করিলেন না। আত্মনির্ভরশীল মহাপুরুষ সকল রকমেই আপনার সংসারের খরচ কমাইয়া পুত্রকে পড়াইবার জন্য—হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি করিয়া দিলেন।

তখন ভূদেবের বয়স চৌদ্দবৎসর। তিনি আসিয়া ১৮৩৯ খৃঃ অঃ হিন্দুকালেজের অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন।

তখন হিন্দুকালেজের সেই শ্রেণীতে স্বনামধন্য—মহাকবি মধুসূদন, গৌরদাস বসাক প্রভৃতি বঙ্গের অনেক সুসন্তান পড়িতেন। মধুসূদনের সহিত ভূদেবের পরিচয় হইয়া গেলে পরস্পরের প্রতি পরস্পরের ভালবাসা বাড়িয়া শীঘ্রই দুইজনে প্রগাঢ় বন্ধুত্ব স্থাপিত হইল।

হিন্দুকালেজে ভর্ত্তি হওয়ার পর যে কারণে (মাইকেল) মধুসূদন দত্তের সহিত ভূদেবের পরিচয় হয়, তাহা বড়ই কৌতূহলজনক। সে ব্যাপারে ভূদেবের অসাধারণ পিতৃভক্তি, সত্যপ্রকাশে সাহস এবং আত্মনির্ভরতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

ভূদেব যেদিন হিন্দুকালেজের অষ্টমশ্রেণীতে ভর্ত্তি হন, সেইদিনই ঐ শ্রেণীর শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র ভূগোল পড়াইতেছিলেন। তিনি জানিতেন ভূদেব ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে—আর তাহার বিশ্বাস ছিল যে, সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতই ভূগোল বিদ্যায় অনভিজ্ঞ। তাই তিনি নূতন ছাত্র ভূদেবের দিকে চাহিয়া বলিলেন—'পৃথিবীর আকার কমলা লেবুর মত গোল। কিন্তু ভূদেব, তোমার বাবা এ কথা স্বীকার করিবেন না।' ভূদেব নিঃশব্দে মিত্র মহাশয়ের এ কথাটা শুনিয়া লইলেন।

স্কুল ছুটি হইল, ভূদেব বাড়ী ফিরিলেন। রামবাবুর কথাটা তখনো ভূদেবের মনের মধ্যে ঝড়ের মত ছুটাছুটি করিতেছিল। তিনি

কাপড়চোপড় না ছাড়িয়াই তর্কভূষণ মহাশয়ের কাছে যাইয়া উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা পৃথিবীর আকার কিরূপ ?"

তর্কভূষণ মহাশয় স্বাভাবিক ধীর গম্ভীর ভাবে বলিলেন—"কেন বাবা, পৃথিবীর আকার গোল।" এই বলিয়া তিনি সংস্কৃত 'গোলাধ্যায়-নামক' পুস্তক খানা ভূদেবকে দেখাইয়া দিলেন। ভূদেব তাহা খুলিয়া দেখিলেন উহাতে লেখা আছে—"পৃথিবী করতলস্থিত আমলকীর মত গোল।" ভূদেব সেই সংস্কৃত কথা কয়টী লিখিয়া লইলেন। পরদিন স্কুলে যাইয়াই শ্রেণীর শিক্ষক রামচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে সব কথা বলিলেন। রামচন্দ্র মিত্র তখন নিজের দোষটুকু স্বীকার করিলেন।

ভূদেব একদিন মাত্র স্কুলে গিয়াছেন, তবু তিনি যে সাহস করিয়া শিক্ষকের ভুল ধারণা ধরাইয়া দিলেন—পিতার অজ্ঞতার অপবাদ দূর করিলেন—হিন্দুর ভূগোল জ্ঞানের পরিচয় দিলেন, তাহা বড়ই বিচিত্র। শ্রেণীর ছাত্রদিগের মধ্য হইতে মধুসূদন দত্ত তখন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভূদেবকে দেখিতেছিলেন। ভূদেবও তাহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন। স্কুল ছুটি হইতেই মধুসূদন আসিয়া ভূদেবের সহিত পরিচয় করিলেন। এই পরিচয় বন্ধুত্বে পরিণত হইয়া চিরজীবন স্থায়ী হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে ভূদেবের সহিত যে কেবল মধুসূদনের পরিচয় হইল তাহা নহে—ভূদেবও পাশ্চাত্যদিগের লিখিত ব্যাপারের মত—হিন্দু জাতির তেমন ব্যাপার আছে কিনা তাহা খুঁজিয়া লইতে, বিচার করিতে —ভালমন্দ বুঝিয়া লইতে লাগিলেন। ইহার ফলে তিনি ক্রমে ক্রমে হিন্দুর শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বপ্রকার সামাজিক, পারিবারিক ও আচার বিষয়ক ব্যাপারে অনুরাগী হইয়া উঠেন এবং স্বদেশ ও স্বধর্ম্মে একান্ত ভক্তিমান হন। কিন্তু তিনি কোন কালেই অন্ধভাবে কিছুর অনুসরণ করিতেন না।

এই সময়ে ভূদেবের একখানি ইংরাজী অভিধানের আবশ্যক হইল। তিনি লোকের বাড়ী হইতে যে সব দক্ষিণা পাইতেন তাহা

জমাইয়া দুই টাকা দশ আনা করিয়াছিলেন ; উহা লইয়াই চিনাবাজারে অভিধান কিনিতে গেলেন। কিন্তু যে অভিধান দেখিলেন তাহার দাম চারি টাকা। ভূদেব কি করিয়া লইবেন ?

বইখানি ভাল, তাই সেখানার উপরে বালকের মন পড়িয়া রহিল। অন্য পাঁচ দোকান ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিয়া কেবলই সেই অভিধান খানিই বারংবার দেখিতে লাগিলেন এবং দুই টাকা দশ আনাতে দিবার জন্য কেবলই দোকানীকে অনুরোধ করিতে লাগিলেন। দোকানদার বেণীমাধব দে সদাশয় লোক, বালকের পড়ার অনুরাগ দেখিয়া তাঁহার পরিচয় এবং নাম ধাম জানিয়া লইয়া সেই দামে সে অভিধানখানি তো দিলেনই, আরও বলিলেন, "ইংরাজী পুস্তকের দাম ঢের, তুমি তো কিনিতে পারিবে না, আমার দোকান হইতে এক একবার আসিয়া চার পাঁচখানি করিয়া বই লইয়া যাইও আর পড়া হইলে ফেরৎ দিও।"

ভূদেব যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহার পিতা অতি কষ্টে কালেজের মাহিনাটা দিতেন, তাহার উপর আর কিন্তু পুস্তক কিনিয়া দিবার শক্তি ছিল না। ভূদেব সেই বেণীবাবুর দোকান হইতে পুস্তক আনিয়া নোট লিখিয়া লইয়া আবার বহি ফেরৎ দিয়া আসিতে লাগিলেন। এইরূপে সেই অধ্যবসায়শীল বালক কঠোর পরিশ্রমে লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন।

শুধু তাহাই নহে। সেইকালে হিন্দুকালেজের ছাত্রেরা বড়ই উচ্ছৃঙ্খলচরিত্র, ধর্ম্মজ্ঞানশূন্য, ভ্রষ্টাচারী হইয়া পড়িতেছিল। তাহারা দেশীয় সকল বিষয়কে ঘৃণায় পরিত্যাগ করিয়া কেবলই সাহেবদিগের অনুকরণ করিত এবং সাহেবী-ব্যবহারই সভ্যতার লক্ষণ বলিয়া ভাবিত। তাহাদের ভিতরে থাকিয়াও ভূদেব কিন্তু একদিনের জন্যও বিচলিত হন নাই। বরাবর হিন্দুধর্ম্মে অগাধ ভক্তি বিশ্বাস রাখিয়া—কি ঘরে কি বাহিরে—বাপ-ঠাকুর-দাদার আচার বিচার মত চলিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত ভাবিতেন।

এমন কি টিফিনের সময় বালকেরা যখন মুসলমানের বিস্কুট পাঁউরুটি প্রভৃতি কাছে কিনিয়া খাইয়া গৌরব বোধ করিত, তিনি তখন ক্লাস হইতে বাহিরও হইতেন না—তখনও একমনে বসিয়া বই পড়িতেন এবং পিপাসায় গলা শুকাইয়া গেলেও কখনও একদিনের জন্য স্কুলের জল খাইতেন না।

তারপর বাড়ী আসিয়া ব্রাহ্মণের নিত্যকর্ম্মসকল ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত সম্পন্ন করিতেন, এবং সময়ে সময়ে যজমান বাড়ী গিয়া ছোট খাট ক্রিয়া-কর্ম্ম পর্য্যন্ত করাইয়া আসিতেন। এইরূপে যতই দিন দিন বড় হইয়া তিনি বেশী লেখাপড়া শিখিতে লাগিলেন—ততই হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি, দেবতায় বিশ্বাস এবং হিন্দু সমাজের প্রাচীন আচার ব্যবহারের উপর অটল আস্থা ও সম্মান বুদ্ধি জন্মিতে লাগিল। হিন্দু সন্তানের ইহাই প্রকৃত মহত্ত্ব।

(৪)

অষ্টম শ্রেণী হইতে একেবারে ডবল প্রমোশন লইয়া ষষ্ঠ শ্রেণীতে উঠিয়া ভূদেবের কিছুমাত্র অসুবিধা হইল না—বরং তাঁহার পাঠে অনুরাগ আরও বাড়িয়া পরিশ্রমের শক্তি এবং অধ্যবসায় দিন দিন বাড়িতে লাগিল। তাহার ফলে সে শ্রেণীতেও সর্ব্বোচ্চ হইয়া এক বৎসর পরেই তিনি পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিলেন।

পঞ্চম শ্রেণীতে উঠিবার পর হইতে মা সরস্বতী যেন তাঁহার প্রিয় সাধককে কোলে লইয়া বসিলেন। প্রত্যহ স্কুলের পড়া সুন্দররূপে আয়ত্ত করিয়াও ভূদেব এত সময় পাইতেন যে, সেই সময়ে আরো বেশী রকম উচ্চ শ্রেণীর বই পড়িবার জন্য তাঁহার আগ্রহ বাড়িতে লাগিল। তখন মধুসূদন এবং তিনি—দুই বন্ধু একত্র মিলিয়া—কে কত বেশী

পড়িতে ও শিখিতে পারে বাজী রাখিয়া তাঁহারা কালেজের লাইব্রেরী হইতে পুস্তক লইয়া পড়িতে আরম্ভ করিলেন।

দেখিতে দেখিতে সে লাইব্রেরী প্রায় শেষ হইয়া আসিল, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের বিদ্যা ও জ্ঞান এরূপ বাড়িতে লাগিল যে, কালেজের শিক্ষকেরা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলেন এবং ক্ষণজন্মা বালক বলিয়া তাঁহাদের প্রতি ভালবাসাও অত্যন্ত বাড়িল। তখন পঞ্চম শ্রেণীতে পড়িলেও ভূদেব বোধ হয় অনায়াসে প্রথম শ্রেণীতে শিক্ষকতা করিতে পারিতেন। অনেক কঠিন কঠিন বড় বড় ইংরাজী বই—যাহার নামও তাঁহার শিক্ষক মহাশয় শুনেন নাই—ছাত্র সে সব বই পর্য্যন্ত পড়িতে লাগিল!

শুধু এইরূপে অহোরাত্র ডবল বই পড়িয়াই কিশোরবয়স্ক ভূদেব তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না—তিনি তাহার যথারীতি অনুশীলন আরম্ভ করিলেন। পঞ্চম শ্রেণীতে সহপাঠিগণের সকলেরই যাহাতে ইংরাজী-সাহিত্যে জ্ঞানের উন্নতি হয়, সেই অভিপ্রায়ে ভূদেব সংবাদপত্রের অনুকরণে আগাগোড়া হাতে লিখিয়া এক পত্রিকা বাহির করিতে লাগিলেন। এই পত্রিকার নাম হইল—"প্রাইভেট অবজারভার"। ভূদেব যথানিয়মে ঠিক সময়ে আগাগোড়া নিজের হাতে নানা বিষয়ের প্রবন্ধ লিখিয়া উহা বাহির করিয়া আপনার ক্লাশের প্রত্যেক ছাত্রকে পড়াইতে লাগিলেন—কিন্তু ইহার জন্য কাহাকেও এক পয়সাও চাঁদা দিতে হইল না। শিক্ষকেরা ভূদেবের এই অদ্ভুত কার্য্য এবং অদ্ভুত শক্তি দেখিয়া একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

কলিকাতায় বেচুচাটার্জ্জীষ্ট্রীট নামে একটা পথ আছে। যাঁহার নামে ঐ পথের নাম হইয়াছে, সেই বেচু (বেচারাম) চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রের নাম পঞ্চু (পঞ্চানন) চট্টোপাধ্যায়। পঞ্চু চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র গিরিশ চট্টোপাধ্যায়। ভূদেব যখন হিন্দু স্কুলে পঞ্চম শ্রেণীতে পড়েন,

তখন উক্ত পঞ্চু চট্টোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কন্যার সহিত ভূদেবের বিবাহ হয়। ভাবী কালে এই বিবাহের ফল অতিশয় ভাল হইয়াছিল।

ভূদেব যখন হিন্দুকলেজে পড়িতেন, তখন মধুসূদন দত্ত ও আব্দুল লতিফ তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন। তিনজনের মধ্যে একদিন কথাচ্ছলে আলাপ হইল যে, লেখাপড়া শিক্ষার পর কে কি হইবেন, কে কি চাহেন। তখন মধুসূদন বলিলেন "আমি বড় কবি হইব"। আব্দুল লতিফ বলিলেন "আমি উচ্চ রাজকর্ম্মচারী হইব।" ভূদেব বলিলেন "জন্মভূমির কাজে যেন বিন্দুমাত্রও লাগিতে পারি।"

তিনজনেরই আশা ফলিয়াছিল। মধুসূদন কবি হইয়া মেঘনাদ-বধ, বীরাঙ্গনা প্রভৃতি কাব্য লিখিয়া শ্রেষ্ঠ কবির সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। আব্দুল লতিফ ইংরেজ সরকারে চাকরী করিয়া নবাব বাহাদুর ও সি. আই. ই. উপাধি পান, শেষে ভূপালের রাজমন্ত্রী হন।

সেই সময় হইতেই হিন্দু কালেজে 'সিনিয়র' এবং 'জুনিয়র' বৃত্তি পরীক্ষার সৃষ্টি হইল। নিয়ম হইল যে—বালকেরা প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী হইতে সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিতে পারিবে এবং তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণী হইতে জুনিয়র বৃত্তিপরীক্ষা দিতে পারিবে।

ভূদেব দেখিলেন যে আরো একবছর ধরিয়া পড়িয়া চতুর্থ শ্রেণীতে না উঠিলে আর জুনিয়ার বৃত্তিপরীক্ষা দিবার উপায় নাই। তখন তিনি বন্ধুবর মধুসূদন এবং তাহার অপর দুইজন সহপাঠী ভালছেলের সঙ্গে মিলিয়া কর্ত্তৃপক্ষের কাছে এক দরখাস্ত করিলেন যে—পঞ্চম শ্রেণীতে থাকিতেই অন্ততঃ তাঁহাদের চারিজনকে জুনিয়র বৃত্তি-পরীক্ষা দিতে অনুমতি দেওয়া হউক।

সেই বৃত্তি-পরীক্ষা নিতান্ত কঠিন। ছেলেদের বিদ্যাবুদ্ধি পরীক্ষা করিবার জন্য যে সব বইয়ের যে সব স্থান ছেলেরা পড়ে নাই—সেই সব জায়গা হইতেই অত্যন্ত কঠিন করিয়া প্রশ্ন করা হইত।

পরীক্ষক হইতেন তখনকার সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয় স্বয়ং এবং পরীক্ষার কালে গোরা-সৈন্য পাহারা থাকিত। সুতরাং সে পরীক্ষা দেওয়া বড় সহজ কথা নয়—তাহাতে উত্তীর্ণ হওয়া তো আরো কঠিন কথা।

ছেলেমানুষ বালক চারিজনের দরখাস্ত পড়িয়া কর্ত্তৃপক্ষ উহা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলেন। কিন্তু যখন কালেজের অধ্যাপক সাহেবেরা আবেদনকারী ছাত্রদের বিদ্যা, বুদ্ধি, পরিশ্রম এবং লেখাপড়ার অনুশীলনের কথা বলিয়া অশেষ প্রশংসা এবং কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিলেন—তখন বালক চারিজন পরীক্ষা দিবার অনুমতি পাইল।

ইহার পূর্ব্বেই তেজস্বী ব্রাহ্মণ বিশ্বনাথ—মর্য্যাদাহানির ভয়ে—একটি মোটা রকম বাৎসরিক বৃত্তি ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাহার জন্য ভূদেবদের সংসারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ হইয়াছিল, এমন কি তাঁহার কালেজের ষোল মাসের মাহিনা আশী টাকা বাকী পড়িয়াছিল। ঐ টাকা শোধ করিয়া আবার মাসে মাসে পাঁচ টাকা মাহিনা দিবার শক্তি ভূদেবের পিতার আর ছিল না এবং সেই জন্য পড়াশুনা বন্ধ হইবার ভয়ে ভূদেবের মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল।

যখন সেই সিনিয়র-জুনিয়র-বৃত্তি-পরীক্ষার ফল বাহির হইল, তখন দেখা গেল যে, অসীম সাহসসম্পন্ন, অক্লান্ত পরিশ্রমী, মা সরস্বতীর একনিষ্ঠ সাধক একান্ত ভক্ত ভূদেবই সেই জুনিয়র বৃত্তি পাইয়াছেন। এই ব্যাপারে অনুরোধকারী শিক্ষকগণের যেমন মুখ উজ্জ্বল হইল—সন্তানের গৌরবে মাতাপিতাও তেমনি গৌরবান্বিত হইয়া উঠিলেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ভূদেবেরও মনের যত কিছু ভয় ভাবনা দূর হইল। তিনি সেই বৃত্তির টাকা হইতে কালেজের দেনা শোধ করিয়া মাসে মাসে যথারীতি মাহিনা দিয়া পড়িতে লাগিলেন।

ইহার পর ভূদেব এবং তাঁহার সহপাঠী বন্ধু মধুসূদন ও অপর

দুইজন ছাত্র—চারিজনেই একেবারে তিন গুণ প্রমোশন পাইয়া পঞ্চম শ্রেণী হইতে একেবারে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠিয়া গেলেন। এরূপ আশ্চর্য্য ব্যাপার হিন্দুকালেজে সেই একবার ভিন্ন আর কখনও ঘটে নাই। এই ব্যাপার অবধি হিন্দুকালেজের অধ্যক্ষ কাপ্তেন রিচার্ড্‌সন সাহেব এবং অন্যান্য সকল সাহেব অধ্যাপকই ভূদেবকে ঠিক আপন আপন সন্তানের মত ভালবাসিতে লাগিলেন।

এই সময়ে স্বনামখ্যাত স্বর্গীয় রামগোপাল ঘোষ মহাশয়, হিন্দু-কালেজে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের রচনার জন্য, একটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্য পদক দান করিলেন। নিয়ম হইল—প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে "স্ত্রী-শিক্ষা" সম্বন্ধে যে দুইজন ছাত্র ইংরাজীতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনা লিখিতে পারিবে তাহারা ওই দুটি পদক পাইবে।

হিন্দুকালেজের উচ্চশ্রেণীর সুশিক্ষিত ছাত্রগণের মনে তখন স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি এমন ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা ছিল যে, কোন ছাত্রই ওই রচনার পরীক্ষা দিতে সম্মত হইল না। তখন একমাত্র ভূদেব সকলকে অশেষপ্রকারে বুঝাইয়া দিলেন—যে জাতি স্বদেশের এবং স্বজাতির প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতে জানে না, তাহারা পশুর অপেক্ষা অধম; আত্মমর্য্যাদাশূন্য জন্মভূমির কুলাঙ্গার সন্তান শত বিদ্বান হইলেও মূর্খের চূড়ামণি এবং মহাপাতকী—সে প্রকার জাতির নাম পৃথিবীর বুক হইতে একেবারে মুছিয়া যাওয়াই ভাল।

তারপর তিনি যখন অশেষপ্রকার প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া আর্য্যজাতির গৌরব-কাহিনী সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন, তখন সকলে আপনাদের মহাভ্রম বুঝিতে পারিয়া সেই পরীক্ষা দিতে সম্মত হইল। সেই রচনা পরীক্ষা দিয়া ভূদেব রৌপ্য মেডেল পাইলেন।

এইরূপে সেই বয়স হইতেই ভূদেবের অন্তরে যে স্বদেশবৎসলতা এবং আত্মমর্য্যাদা জ্ঞানের অঙ্কুর দেখা দিয়াছিল তাহাই কালে ফলেফুলে

সুশোভিত হইয়া দেশের ইতিহাসে তাঁহার নাম অমর এবং কীৰ্ত্তি অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে।

তাঁহাদের মধ্যে ভবিষ্যতে কে কি হইবেন কেহ সে কথা জিজ্ঞাসা করিলে মধুসূদন যেমন বলিতেন যে "আমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি হইব" এবং অপরাপর সকলেও নিজ নিজ উচ্চাশার কথা কহিতেন ভূদেবও তেমনি বলিতেন যে—

"বড় হইয়া যদি মাতৃ-ভূমির গৌরব, সম্মান ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি এবং দেশের কোন কার্য্যে লাগিতে পারি, তাহা হইলেই আমার জন্ম ও জীবন সার্থক ভাবিব।"

স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি এই ভাব বাল্যকাল হইতেই ভূদেবের অন্তরে প্রবল ছিল। দেশের প্রাচীন সমস্ত রীতি-নীতি—আচার ব্যবহারের প্রতি তাহার অত্যন্ত শ্রদ্ধা ছিল, প্রাচীন আর্য্য ঋষিগণকে দেবতার স্বরূপ ভাবিয়া তিনি সর্ব্বদাই মনে মনে অচলা শ্রদ্ধাভক্তির সহিত স্মরণ ও পূজা করিতেন। কেহ সাহেবসুবোদের অযথা অনুকরণ করিলে তিনি মনে মনে অত্যন্ত চটিয়া উঠিতেন এবং প্রকাশ্যে তাহার ভ্রম বুঝাইয়া দিতে ছাড়িতেন না।

তা বলিয়া যে তিনি বিদেশীয়গণের পক্ষপাতী ছিলেন না—এমন নয়। বরং সাহেবসুবোগণের গুণের জন্য তিনি তাঁহাদিগকেও উচ্চতর আসন দিয়া অশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন এবং সেই রকম গুণবান হইতে আপনিও চেষ্টা করিতেন ও সকলকে চেষ্টা করিতে বলিতেন। তাঁহার ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছিল কেবল হীন দোষগুলির অনুকরণের উপর।

এরূপ শুদ্ধ, কর্ত্তব্যনিষ্ঠ, ধর্ম্মভীরু, দেবভক্ত, আত্মমর্য্যাদা-সম্পন্ন মহাচরিত্রবান্ হইয়াও ভূদেব কালমাহাত্ম্যে এবং সঙ্গগুণে একসময়ে ভ্রমের হাত হইতে নিস্তার পান নাই। বিশ্বনাথ তর্কভূষণের মত অমন সর্ব্ববিদ্যা-পারদর্শী দিগ্বিজয়ী মহাপণ্ডিত পিতা না থাকিলে—সেই ভ্রমের

মোহ হইতে উদ্ধার পাইয়া আজ তিনি এমন দেশবিখ্যাত, দেবচরিত্র মহাপুরুষ হইতে পারিতেন কি না সন্দেহ।

(৫)

তখনকার দিনে ভাল ইংরাজী শিখিবার ঝোঁক—নেশার মত—হিন্দু-কালেজের ছাত্রগণকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছিল, উত্তমরূপ ইংরাজী শিখিবার জন্য তাহারা সকল কার্য্যই করিতে পারিত। সুতরাং তাহারা যখন শুনিল যে 'বাইবেল' না পড়িলে ইংরাজী-বিশারদ হওয়া যায় না, তখন সকলেই বাইবেল পড়িবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল। ভূদেবও অত্যন্ত যত্নের সহিত সমস্ত বাইবেল আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন।

প্রথম ইংরাজী শিখিবার সময়ে উলাষ্টোন সাহেব এবং মিশনারী বিবি উইলসনের সংশ্রবে আসিয়া ভূদেব সর্ব্বদাই বাইবেলের ধর্ম্মনীতির উচ্চ প্রশংসা শুনিতে পাইতেন। বাইবেল পড়িয়া দেখিলেন যে, বাস্তবিকই তাঁহাদের কথা মিথ্যা নহে। তার উপর তখন এদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের জন্য পাদরী সাহেবেরা অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিয়া তুলিয়াছিলেন। ক্রমাগত সেই সব শুনিয়া শুনিয়া তাঁহার মন চঞ্চল হইয়া উঠিল, হিন্দুধর্ম্মকে "পৌত্তলিকের" ধর্ম্ম বলিয়া মনে ধারণা জন্মিতে লাগিল।

ভূদেবদের বাড়ীতে ঠাকুরঘরে শালগ্রাম ছিল, প্রত্যহ তিনিই তাঁহার আরতি করিতেন। একদিন আর আরতি করিলেন না। শুনিয়া বিশ্বনাথ তাঁহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি জবাব দিলেন—"উহাতো পুতুল পূজা করা—উহাতে পাপ হয়।"

শুনিয়া তর্কভূষণ মহাশয় পুত্রের উপর রাগ করিলেন না, পুত্রকে বকিলেন না, গালমন্দ দিলেন না। কেবল মাত্র বলিলেন যে—

"যদি ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস না হয়, তবে আরতি করিও না।

ভক্তি ও বিশ্বাস না থাকিলে অপবিত্রমনে ঠাকুর ঘরে ঢুকিতে নাই, সুতরাং আরতি না করিয়া ভালই করিয়াছ, কারণ ঠাকুর দেবতার সঙ্গে কপটতা চলে না—তাহাতে সর্ব্বনাশ হয়।”

ভূদেব সর্ব্বদাই মিশনারীদের কাছে শুনিতেছিলেন যে, ধর্ম্মের জন্য নিরন্তর উৎপীড়ন সহিতে হয় সুতরাং তিনিও পিতামাতার নিকট হইতে মনে মনে সেইরূপ প্রত্যাশা করিয়া প্রস্তুতও হইতেছিলেন। কিন্তু যখন, উৎপীড়ন দূরে থাক—তাঁহার পরম পণ্ডিত গোড়া হিন্দু পিতা—একটা কঠোর কথাও বলিলেন না—তখন তাঁহার মন বড়ই বিচলিত হইল।

সেইদিন হইতে তিনি পিতাকে ধর্ম্মের কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ তখন প্রতিদিন পুত্রকে সঙ্গে লইয়া প্রাতে গঙ্গাস্নানে গমন করিতে লাগিলেন এবং পথিমধ্যে দুটি একটি করিয়া কথায় কথায় নানাপ্রসঙ্গে হিন্দুধর্ম্মের যথার্থ তত্ত্ব এবং সার জিনিষ বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন।

নিজের ভুল বুঝিয়া ভূদেব অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন। মন আবার ফিরিয়া গেল, ভাবিলেন—“আমরা কি মূর্খ, উত্তমরূপ সংস্কৃত না শিখিয়া হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের ভিতরকার জিনিষ না বুঝিয়া এমন শ্রেষ্ঠ সনাতন ধর্ম্মকে ঘৃণা ও অশ্রদ্ধা করিয়া অন্য ধর্ম্মকে ভাল বলি!” সেই হইতে হিন্দুধর্ম্মের উপর ভূদেবের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি অচল হইল—তিনি দেবদ্বিজে ভক্তিপরায়ণ পরমহিন্দু হইয়া উঠিলেন।

বিশ্বনাথ শুধু এইরূপে পুত্রের মন ফিরাইয়া দিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলেন না। তখন ভূদেব কালেজে বিদেশী বড় বড় লেখকের লেখা,—বড় বড় কবিদের কাব্য পড়িতেছিলেন। তাঁহার মুখে ইংরাজীর সেই সব পুস্তকের ভাব ও সৌন্দর্য্য বুঝিয়া লইয়া বিশ্বনাথ আমাদের দেশের প্রাচীন সংস্কৃত মহাকবিগণের কাব্য হইতে স্থানে স্থানে পড়িয়া পুত্রকে বুঝাইয়া

দিতে লাগিলেন যে,—"আমাদের মাতৃভাষা সংস্কৃতেও সে রকম ভাব ও সৌন্দর্য্যের অভাব নাই, বরং আরো বেশী আছে।"

দেখিয়া শুনিয়া ভূদেব স্তম্ভিত হইয়া ভাবিলেন—'আমরা কত হীন—কত মূর্খ! এমন প্রাচীন শ্রেষ্ঠ আর্য্যভাষা না শিখিয়া—তাহাদের ভিতরে যে কত মণি মাণিক্য আছে তাহা না দেখিতে চাহিয়া শুধু ইংরাজী পড়িয়া মুগ্ধ হইয়া যাই!'

সেই হইতে ভূদেবের মন স্বদেশের, স্বজাতিরও স্বধর্ম্মের গৌরবের দিকে আকৃষ্ট হইয়া উঠিল। আপনি যেমন দেবতা সদৃশ পিতার কৃপায় মহাভ্রমের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়াছেন তেমন সুবিধা তো আর অন্য সকলের নাই, সেইজন্য তিনি সুবিধা পাইলেই বন্ধুগণের ঐরূপ ভ্রম দূর করিয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই ঘটনার পরেই—ধর্ম্ম, পুণ্য ও ভাগ্যবলে যখন পুত্রের মন ফিরিয়া গেল - তখন বিশ্বনাথ আর বিলম্ব করিলেন না, পুত্রকে গুরুমন্ত্রে দীক্ষা দেওয়াইবার আয়োজন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের গুরুগোষ্ঠী লোপ হইয়াছিল তজ্জন্য ভূদেবের জননীকে দিয়া পুত্র এবং পুত্রবধূকে মন্ত্রদান করাইলেন। সেই হইতে এই বংশে মাতার নিকট হইতেই মন্ত্র গ্রহণের নিয়ম চলিয়া আসিতেছে।

মন্ত্র লইবার পর ভূদেব, যেমন সকল নিয়ম পালন করিতে হয় তেমনি পালন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ গভীর নিশাকালে চারি হাজার করিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিলেন। রাত্রে পেট ভরিয়া আহার করিলে পরিশ্রমে ব্যাঘাত ঘটিবে, আলস্য ধরিবে ভাবিয়া, তিনি বরাবরই শুধু সাগু খাইয়া রাত্রিতে লেখাপড়া করিতেন। এক্ষণেও তেমনি সাগু মাত্র খাইয়াই রাত্রিতে পড়াশুনা ঠিক পূর্ব্বের মত বজায় রাখিয়াও যথারীতি জপ করিতে লাগিলেন এবং প্রত্যহ স্নান করিয়া উঠিয়া মায়ের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, তবে কলেজে যাইবার জন্য আহারে বসিতে আরম্ভ করিলেন।

এইরূপে তিনি সন্ধ্যা, গায়ত্রী প্রভৃতি সমস্ত মন্ত্র তন্ত্রের অর্থ বুঝিয়া লইয়া সেই সব যতই যথানিয়মে পালন করিতে লাগিলেন, তখন হইতে ততই তাঁহার মন পবিত্র সত্বগুণ-সম্পন্ন ঋষিভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল এবং ততই তাঁহার মনের বল ও দেহের লাবণ্য শতগুণে বাড়িয়া উঠিল।

এদিকে তখন ভূদেব ফরাসী এবং অন্যান্যদেশীয় বড় বড় লেখকদের অনেক ভাল ভাল পুস্তকের ইংরাজী অনুবাদ পড়িয়া গভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে বিখ্যাত ডফ্ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল। ডফ্ সাহেব গোঁড়া পাদরী হইলেও পরম পণ্ডিত ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি ভূদেবের কাছে আর খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা মাত্রও করিলেন না, বরং তাঁহাকে ভালবাসিয়া ইতিহাস ও মনোবিজ্ঞান শাস্ত্রে তাঁহাকে অনেক শিক্ষা প্রদান করিলেন।

এইরূপে সেই ষোল বৎসরের বালক ভূদেব অসাধারণ পরিশ্রম, যত্ন, অনুরাগ ও ঐকান্তিকতার বলে কঠোর সাধনা করিয়া যে অতুল জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য লাভ করিলেন, আজকাল তাঁহার দ্বিগুণবয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে একজনও সেরূপ পারেন কিনা সন্দেহ। ইহার কারণ কেবল গুরুজনে ভক্তি, স্বদেশ ও স্বধর্ম্মে প্রীতি, ঐকান্তিক অনুরাগ, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কঠোর সাধনার অভাব।

ষোল বৎসর বয়সে ভূদেবের মাতৃ-বিয়োগ হইল, তখন একমাত্র স্নেহময় পিতা ভিন্ন তাঁহার আর অবলম্বন রহিল না।

ইংরাজী ১৮৪৩ সালে দ্বিতীয় শ্রেণী হইতেই ভূদেব প্রশংসার সহিত সিনিয়র-বৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিলেন এবং মাসিক ৪০৲ চল্লিশ টাকা করিয়া পাইতে লাগিলেন। ঐ টাকা তাঁহাদের দরিদ্রের সংসারের একটা প্রধান অবলম্বন স্বরূপ হইল।

এই চল্লিশ টাকার মাসিক বৃত্তি এক বৎসর মাত্র থাকিত। পর

বৎসরে আবার যিনি সিনিয়র পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ হইতেন তিনি উহা পাইতেন। বৃত্তি লইয়া প্রথম শ্রেণীতে উঠিয়া ভূদেবকে তিন বৎসর পড়িতে হইল। প্রথম শ্রেণীতে তিন বৎসর পড়াই তখনকার নিয়ম ছিল। তারপর ছাত্রেরা শেষ সার্টিফিকেট পাইয়া কলেজ ছাড়িত। সুতরাং ঐ তিন বৎসর ধরিয়া ঐ বৃত্তিটি বজায় রাখিবার জন্য তাঁহাকে প্রতি বৎসরেই আবার পরীক্ষা দিতে হইতে লাগিল। কিন্তু অসামান্য সাধনা বলে তিনি তিন বৎসর ধরিয়া একাই ঐ বৃত্তিটি দখল করিয়া রাখিলেন। ধন্য ভূদেবের কঠোর সাধনা!

এইরূপে ছয় বৎসর ধরিয়া হিন্দুকালেজের পড়া শেষ করিয়া ইংরাজী ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ভূদেব কালেজ হইতে বাহির হইলেন এবং ১৮৪৬ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি কালেজের সার্টিফিকেট পাইলেন। তখন চাকরির চেষ্টায় লাগিলেন। এই সময়ে ভূদেবের বয়স একুশ বৎসর মাত্র।

কালেজে পড়িবার সময় হইতেই তখনকার শিক্ষাবিভাগের সেক্রেটারী "মাউয়েট" সাহেবের সঙ্গে ভূদেবের পরিচয় হইয়াছিল। সাহেবও ভূদেবের গুণগ্রাম দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট ছিলেন। কালেজ ছাড়িয়া ভূদেব চাকরির জন্য তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন।

"মাউয়েট" সাহেব আনন্দিত হইয়া তখনি তাঁহাকে দেড়শত টাকা বেতনে এক স্কুলের হেড মাষ্টারের কর্ম্ম দিতে চাহিলেন। কিন্তু স্বধর্ম্ম-প্রবণ, দেশ-হিতৈষী, পণ্ডিত-যুবক ভূদেব, চিন্তা করিয়া কহিলেন—

"দেখুন শিক্ষাবিভাগে এমন কোনই নিয়ম নাই যাহাতে স্কুলের ছাত্রগণকে তাহাদের নিজ নিজ ধর্ম্ম সম্বন্ধে অন্ততঃ মোটামুটি কিছু শিক্ষা দিতে পারা যায়। এই জন্যই ধর্ম্মশিক্ষা-বিহীন বিদ্যায় এ দেশের লোকের তেমন সুফল ফলে না। যদি স্বদেশবাসীকে তাহার স্বধর্ম্মের

শিক্ষা দিয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে লেখাপড়া শিখাইয়া মানুষ করিয়া তুলিতে না পারি, তবে আমার তেমন মাষ্টারীতে দেশের কি উপকার হইবে? অতএব ওরূপ চাকরি আমি করিতে ইচ্ছা করি না।”

এই বলিয়া ভূদেব সেই সর্ব্ব প্রথম দেড়শত টাকা বেতনের চাকরি অগ্রাহ্য করিয়া চলিয়া আসিলেন।

---

(৬)

সেই সময়ে এ দেশে ইংরাজ মিশনারীরা অনেকগুলি স্কুল স্থাপন করিয়া দেশের লোককে বিদ্যা দানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্রের শিক্ষা দিয়া খৃষ্টান করিবার জন্য অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছিলেন, এবং তাঁহারা যে তাহাতে ফলও পান নাই এমন নয়। সেই কালে অনেক সম্ভ্রান্ত হিন্দুর সন্তান ইংরাজী শিখিয়া খৃষ্টানও হইতেছিলেন। এই সব দেখিয়া শুনিয়া হিন্দুসমাজ বিশেষ বিচলিত হইয়া উঠিয়াছিল।

যাহাতে হিন্দুসন্তানগণকে আর পাদরী সাহেবদের স্কুলে গিয়া পড়িতে না হয়—তজ্জন্য কলিকাতার ধনী সম্প্রদায় মিলিয়া একটি স্থায়ী রকম উৎকৃষ্ট বিদ্যালয় স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। কারণ ইতিপূর্ব্বে দেশীয় লোকেরা যে সব ছোটখাট স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহার কোনটিই স্থায়ী এবং উন্নত হয় নাই।

সেই চেষ্টার ফলে একটির স্থলে দুইটী বড় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া গেল। কলুটোলার বিখ্যাত ধনী মতিলাল শীল ‘সিল্‌স্ ফ্রি কালেজ’ নামে নিজেই একটী উচ্চ শ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। ঐ বিদ্যালয়টি অদ্যাবধি বর্ত্তমান রহিয়াছে।

আর একটি বিদ্যালয় অন্য সকল ধনি-সন্তান চাঁদা দিয়া স্থাপন করিলেন। তাহার নাম হৈল “হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্‌ষ্টিটিউসন”।

ভূদেব নানা স্থানে চাকরির জন্য বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁহার মনের মত কর্ম্ম কোথাও জুটাইতে পারেন নাই। এক্ষণে এই "হিন্দু চ্যারিটেবল ইন্‌ষ্টিটিউসনের" কর্তৃপক্ষগণ তাঁহাকে ষাট টাকা বেতনে হেড মাষ্টার নিযুক্ত করিয়া তাঁহার নিজের ইচ্ছামত ধরণে শিক্ষা দিতে বলিয়া দিলেন। ভূদেব আনন্দের সহিত এই মনোমত কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন।

কিছুদিন পরে ঐ স্কুলটি সম্পূর্ণ ভাবে স্বর্গীয় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের কর্তৃত্বাধীনে আসিয়া পড়ায়, স্কুলে ব্রাহ্ম ধর্ম্মাবলম্বিগণের বড়ই প্রভুত্ব বাড়িয়া উঠিল। তখন মনে মনে বিরক্ত হইয়া ভূদেব ঐ চাকরি ছাড়িয়া দিলেন এবং আপনার ইচ্ছমত আদর্শে স্কুল স্থাপন করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

কর্ম্মবীর, নিঃস্বার্থ ভূদেবের চেষ্টা বিফল হইল না। অসীম চেষ্টা, যত্ন, পরিশ্রম ও আয়োজনে তিনি ফরাসডাঙ্গায় একটি ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া নাম দিলেন—'চন্দননগর সেমিনারী।'

ইংরাজী ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসডাঙ্গায় স্কুল স্থাপিত হইল বটে, কিন্তু তাহার এমন আয় হইল না যাহাতে বেতন দিয়া শিক্ষক রাখিতে পারা যায়। স্কুলের আয় হইতে বাড়ীভাড়া, চাকরের মাহিনা প্রভৃতি দিয়া কোনমতে মাষ্টারদিগের আহার চলিতে লাগিল। ভূদেব তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া কয়েকজন অনুরক্ত দেশহিতৈষী বন্ধুকে লইয়া আপনি প্রধান শিক্ষকরূপে ঐ স্কুল চালাইতে লাগিলেন।

ভূদেব ফরাসডাঙ্গায় একটা বাসা করিলেন, শিক্ষক তিন চারিজনকে লইয়া সেই বাসায় শুধু দুই বেলা মোটা আহার করিয়াই বাস করিতে লাগিলেন এবং দিন দিন যাহাতে ঐ স্কুলের উন্নতি করিতে পারেন সর্ব্বদাই সেই চেষ্টায় রহিলেন। সকলের নিঃস্বার্থ, ঐকান্তিক সাধুচেষ্টা বিফল হইবার নহে; দেখিতে দেখিতে 'চন্দননগর সেমিনারী' খুব উন্নত হইয়া উঠিল।

ভূদেবের আশাও তখন বাড়িয়া গেল। গঙ্গার দুই পার্শ্বে প্রসিদ্ধ বৰ্দ্ধিষ্ণু স্থানসকলে তিনি আরও এইরূপ ইংরাজী স্কুল স্থাপন করিয়া দেশবাসীর অসীম উপকার সাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইলেন। তাহার ফলে, দেখিতে দেখিতে বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী শ্রীপুরে এবং বহরমপুরেও আর দুইটি—'চন্দননগর সেমিনারীর' ব্রাঞ্চ স্কুল খুলিয়া ফেলিলেন। তখন আর ভূদেবের কেবলমাত্র ফরাসডাঙ্গার স্কুল লইয়া থাকিলে চলিল না—নিয়ম করিয়া ওই দুই স্থানেও স্কুল দুইটি যথারীতি নিজে পরিদর্শন করিতে লাগিলেন। শুধু ফরাসডাঙ্গার স্কুল লইয়া থাকিলে ভবিষ্যতে যদিও আয়ের সম্ভাবনা ছিল, এক্ষণে তাহাও গেল। কারণ ঐ স্কুলের যাহা আয় হইতে লাগিল, তাহা এই দুইটি নূতন স্কুলের জন্য খরচ হইতে লাগিল। সুতরাং তিনি যে স্কুল করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিবেন তাহার সম্ভাবনাও রহিল না আর সে ইচ্ছাও তাঁহার ছিল না।

বাপ-ঠাকুরদাদা ঘরে টোল করিয়া ছাত্রদের অন্নদান-পূর্ব্বক বিদ্যাদান করিয়াছেন—ব্রাহ্মণপণ্ডিতের সন্তান—তিনিও সেইরূপে দেশবাসীকে ইংরাজীতে সুশিক্ষিত এবং স্বধর্ম্মে অনুরক্ত করিয়া তুলিবেন—ইহাই ছিল তাঁহার জীবনের একমাত্র আশা এবং মহৎ উদ্দেশ্য। শ্রীপুর এবং বহরমপুরে স্কুল দাঁড়াইয়া গেলে তিনি আবার অন্যান্য স্থানেও ঐরূপ স্কুল স্থাপনের চেষ্টায় রহিলেন। কিন্তু তাঁহার সেই মহৎ উদ্দেশ্যের পথে এক মহা ব্যাঘাত আসিয়া পথ রোধ করিয়া দাঁড়াইল।

এই সময়ে ভূদেব তাঁহার দ্বিতীয় ভগিনীর বিবাহের উদ্যোগের জন্য গৃহে আসিলেন। তর্কভূষণ মহাশয় বহু দিন ধরিয়া অতিকষ্টে সংসার চালাইয়া পুত্রের পড়ার খরচ চালাইয়া তাহাকে মানুষ করিয়া তুলিয়াছিলেন। এক্ষণে পড়া শেষ হইলেও ভূদেব যখন সংসারের ভার কিছুমাত্র ঘাড়ে না লইয়া একেবারে উদাসীনের মত দেশের উপকার করিতে মাতিয়া উঠিলেন—তাঁহাদের দুঃখকষ্টের দিকে ফিরিয়াও চাহিলেন না, তখন

তিনি মনে মনে অত্যন্ত দুঃখিত হইলেও পুত্রকে একটি কথাও বলেন নাই। বিশ্বনাথ নিজের উপার্জ্জন হইতেই—পূর্ব্বের মত—কষ্টে স্বষ্টে সংসার চালাইতেছিলেন, কিন্তু কন্যার বিবাহের অর্থ জমাইয়া রাখিতে পারেন নাই। এক্ষণে পুত্রকে কিছু না বলিয়া তিনি নিজেই এই বিবাহের জন্য আড়াইশত টাকা ধার করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

ঘটনা চক্রে ভূদেব এ কথা জানিতে পারিলেন। তখন শত বৃশ্চিক-দংশনের মত অনুতাপ ও আত্ম-গ্লানিতে তাঁহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। উপযুক্ত সন্তান তিনি—বাপ-মা, না খাইয়াও অগাধ-স্নেহে তাঁহাকে মানুষ করিয়াছেন, আর তিনি কি না তাঁহাদের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা না করিয়া কেবল নিশ্চিন্তমনে দেশের উপকারে মাতিয়া রহিয়াছেন!

একথা যতই মনে হইতে লাগিল, ভূদেব আপনাকে ততই ধিক্কার দিয়া অস্থির হইয়া উঠিলেন এবং কাহাকেও কিছু না বলিয়া স্বরূপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আড়াইশত টাকা কর্জ্জ করিয়া আনিয়া পিতাকে দিলেন।

পরদিনই ময়েট সাহেবের নিকট গিয়া অনুতপ্ত-হৃদয়ে, সরল ভাবে সাহেবকে নিজের সংসারের কথা জানাইয়া একটি চাকরি প্রার্থনা করিলেন। সাহেব তাঁহাকে বড়ই ভালবাসিতেন—তাঁহার দুঃখের কথা শুনিয়া তিনিও দুঃখিত হইলেন। কিন্তু তখন তাঁহার হাতে ভূদেবের উপযুক্ত তেমন চাকরি কিছুই ছিল না। কেবল কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের ৫০৲ টাকা বেতনের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ এবং হিন্দু-কালেজের ৭৫৲ টাকা বেতনের ষষ্ঠ শিক্ষকের পদ—এই দুইটি মাত্র চাকরি খালি ছিল।

ভূদেবের মনের তখন যেরূপ অবস্থা, তাহাতে আর চাকরি সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার সময় ছিল না। তবু তিনি উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগকে পড়াইতে পাইবেন মনে করিয়া ৭৫৲ টাকা বেতনের ষষ্ঠ

শিক্ষকের চাকরি ছাড়িয়া ৫০৲ টাকার দ্বিতীয় শিক্ষকের কর্ম্মটিই লইতে চাহিলেন। সেই অনুসারে সাহেব তাঁহাকে ঐ কর্ম্মেই বাহাল করিলেন।

ইংরাজী ১৮৪৯ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে ভূদেব কলিকাতা মাদ্রাসা কালেজের দ্বিতীয় শিক্ষক নিযুক্ত হইয়া সর্ব্বপ্রথম সরকারী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেন।

অতি অল্প দিনের মধ্যেই মাদ্রাসার মুসলমান ছাত্রগণ যেন কোন মন্ত্রবলে ভূদেব বাবুর এমন বশীভূত হইয়া পড়িল যে, তাহারা হরীতকী বাগান পর্য্যন্ত আসিয়া তাঁহার বাড়ীতে উপস্থিত হইতে লাগিল। পিতা বিশ্বনাথ আবার তাহাদিগকে এমন আদর-যত্নে অভ্যর্থনা ও নানারূপে সৎকার করিতে লাগিলেন যে, তাহারা কোন স্বজাতির বাড়ীতে গিয়াও তেমন আদর-যত্ন ও সমভাব পাইত না। সুতরাং তাহারা যে কোন হিন্দু—বিশেষতঃ কোন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাটীতে আসিয়াছে—তাহা মনে করিতেই পারিত না। এইরূপে ভূদেববাবু মুসলমানগণকে সমান দৃষ্টিতে ঠিক ভাইয়ের মত দেখিয়া সর্ব্বদাই হিন্দু ও মুসলমানকে এক স্নেহের সূত্রে বাঁধিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আর কালেজের শিক্ষা? সে বিষয়ে তিনি এমন অদ্ভুত শক্তি দেখাইলেন যে, তখনকার সাহেব হেডমাষ্টার তাঁহার উপরেই প্রত্যহ দুই তিন ঘণ্টা করিয়া প্রথম শ্রেণীর পড়াইবার ভার অর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তে অন্য কার্য্যে মন দিলেন। ক্রমে এমন হইল যে, কালেজের ছাত্রগণ তাঁহার নিকট ছাড়া অন্য কাহারও কাছে পড়িতেই চাহিত না। এই মাদ্রাসার চাকরি উপলক্ষে অনেক সম্ভ্রান্ত, ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত মুসলমানের সহিত ভূদেবের অত্যন্ত বন্ধুত্ব হইয়া গেল।

ভূদেব যখন মাদ্রাসার দ্বিতীয় শিক্ষক হইলেন, তখন তাঁহার বয়স চব্বিশ বৎসর মাত্র। যৌবনের পূর্ণ উদ্যমে তিনি কার্য্য করিতেছিলেন। এই সময়ে এমন একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে যুবক ভূদেবের

অসীম কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, ব্রাহ্মণোচিত দৃঢ়তা ও বিনয়ের অশেষ পরিচয় পাওয়া যায়।

কর্ণেল রেলি একজন সৈনিক পুরুষ। ভীষণ আকৃতি ও কোপন স্বভাবের জন্য সকলে তাহাকে বাঘের মত ভয় করিত। তার উপর আবার কর্ত্তৃত্ব করিবার আকাঙ্ক্ষাটা তাঁহার অতিরিক্ত মাত্রায় ছিল। ইনি প্রত্যেক বৃহস্পতিবারে মাদ্রাসা কালেজ পরিদর্শন করিতেন।

ভূদেব দ্বিতীয় শিক্ষক হওয়ার পর, মাদ্রাসা কালেজের হেডমাষ্টার ক্লিঙ্গার সাহেব ভূদেবের উপর প্রথম শ্রেণীর পড়ার ভার দিয়া নিশ্চিন্ত-মনে বাহিরে বাহিরে কাটাইতেন। কথাটা কেমন করিয়া রেলি সাহেবের কানে গিয়াছিল।

একদিন কর্ণেল রেলি মাদ্রাসা পরিদর্শন করিতে আসিয়া ভূদেব বাবুকে লাইব্রেরীতে ডাকাইয়া লইলেন। তারপর স্বভাবসিদ্ধ মিলিটারী মেজাজে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি প্রথম শ্রেণীতে পড়াও?"

ভূদেব। প্রথম ও তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রেরা আমার কাছে পড়া অভ্যাসের সহায়তা লইয়া থাকে।

কর্ণেল। আমার কথা কাটাইবার চেষ্টা করিও না। খোলাখুলি বল ত, হেড্‌মাষ্টার স্কুল হইতে চলিয়া যান, আর তুমি প্রথম শ্রেণীতে পড়াও, এ কথা সত্য কি না?

ভূদেব। মহাশয়, হেড্‌ মাষ্টারের কথা আমাকে কেন জিজ্ঞাসা করিতেছেন? তিনি ত স্কুলেই আছেন, যদি আদেশ করেন, তাঁহাকে ডাকিয়া দিতে পারি। নিজের কথা তিনি নিজেই বলিতে পারিবেন।

কর্ণেল। তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে চাও না।

ভূদেব। আমাকে কেন এমন প্রশ্ন করিতেছেন? অনুগ্রহ করিয়া একথা হেড্‌মাষ্টারকেই জিজ্ঞাসা করুন।

কর্ণেল রাগে ফুলিয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন—ভূদেবের দিকে

কয়েক পা সরিয়া আসিয়া কঠোরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন আমি কি তোমাকে এইরূপ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে পারি না ?"

অবস্থা দেখিয়া ভূদেবের মনে হইতেছিল, যে এবার কর্ণেল ধাক্কা মারিয়া তাহাকে নিশ্চয়ই ফেলিয়া দিবেন। তবু তিনি দৃঢ়তার সহিত অথচ সবিনয়ে বলিলেন "না মহাশয়, আমার উপরের কর্ম্মচারীর বিষয়ে আপনি আমাকে এইরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন না।"

ব্যাঘ্রপ্রকৃতি কর্ণেল তীব্রদৃষ্টিতে ভূদেবের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিলেন। তারপর একটু অগ্রসর হইয়া ভূদেবের মাথায় হাতদিয়া কোমল-কণ্ঠে কহিলেন, "যুবক সর্ব্বদা এইরূপ ব্যবহার করিও—তাহা হইলেই তুমি জীবনে উন্নতি করিতে পারিবে।" কর্ণেল চলিয়া গেলেন।

এদিকে ক্লিঙ্গারের প্রাণ ধুক্ ধুক্ করিতেছিল। কর্ণেল চলিয়া গেলে তিনি ভূদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি আমার বিরুদ্ধে কিছু বলিয়াছ ?" উত্তরে ভূদেব বলিলেন "কেন এমন কথা মনে করিতেছেন ? মিঃ ক্লিঙ্গার, আমি ব্রাহ্মণের ছেলে।"

এই কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও তেজস্বিতার জন্য কর্ণেল রেলি স্বয়ং মাউয়েট সাহেবের কাছে যাইয়া ভূদেবকে কোন স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত করিবার জন্য অঙ্গীকার করাইয়া লইলেন।

গুণের পুরস্কার হইল। কর্ত্তৃপক্ষগণ ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের ১৮ই অক্টোবর তারিখে ভূদেবকে দেড়শত টাকা মাসিক বেতনে হাওড়া স্কুলের হেড্ মাষ্টার করিয়া দিলেন।

(৭)

চাকরিতে প্রবৃত্ত হইয়া অবধি ভূদেব মাসে মাসে মাহিয়ানার অর্দ্ধেক টাকা গৃহে দিয়া, বাকী অর্দ্ধেকে ঋণ পরিশোধ করিতে লাগিলেন।

যখন ঋণ শোধ হইয়া গেল, তখন হইতে সেই অর্দ্ধেক টাকা ব্যাঙ্কে জমাইতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে গবর্ণমেণ্টের ধারণা ছিল যে, সাহেবগণ ভিন্ন এ দেশীয় লোকেরা কোন ইংরাজী স্কুলের হেড্ মাষ্টারের যোগ্য হইতেই পারে না। কিন্তু হাওড়া স্কুলে ভূদেবের শিক্ষকতা কার্য্য দেখিয়া গবর্ণমেণ্টের মন হইতে সে ধারণা দূর হইয়া গেল।

সেই সময়ে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি করিবার জন্য 'দেশীয় সাহিত্যসমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সভা হইতে ভাল ভাল বাঙ্গলা পুস্তক ছাপিয়া প্রকাশ করার চেষ্টা হয়। সেই সময়ে ভূদেব সর্ব্বপ্রথম 'মহাত্মা পীটরের জীবন-চরিত' লিখিয়াছিলেন। তারপরে 'শিক্ষা-বিধায়ক প্রস্তাব' নামক পুস্তক রচনা করেন।

তখনকার হাওড়ার ম্যাজিষ্ট্রেট প্রাট সাহেব 'হাওড়া স্কুল কমিটির' সেক্রেটরী ছিলেন। ভূদেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া তিনি তাঁহাকে বড়ই শ্রদ্ধা এবং প্রীতির চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিলেন। সেই সময়ে ভূদেবের সঙ্গে প্রাট্ সাহেবের দেশসংক্রান্ত নানাবিষয়ে কথাবার্ত্তা হইত। একদিন ভূদেব তাঁহাকে বলিলেন যে—"সরকার বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য সর্ব্বসাধারণ লোককে বুঝাইয়া দিবার জন্য যদি একখানি বাঙ্গলা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন, তাহা হইলে রাজা ও প্রজার মধ্যে বিশেষ সদ্ভাব স্থাপিত হইয়া—এ দেশবাসীর বড়ই মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা।"

প্রাট্ সাহেব কথাটা বুঝিলেন এবং গবর্ণমেণ্টকে জানাইলেন। তাহার ফলে ইংরাজী ১৮৫৬ সালে সর্ব্বপ্রথম "এডুকেশন গেজেটের" উৎপত্তি হইল। ভূদেব বাবুকে ঐ কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত করিবার জন্য প্রাট্ সাহেব অনেক লেখালেখি করিলেন, কিন্তু তখন ফল হইল না—গবর্ণমেণ্ট রেভারেণ্ড্ স্মিথ্ সাহেবকে সম্পাদক করিলেন।

ঐ বৎসর এদেশে বাঙ্গলা স্কুল সকলের জন্য শিক্ষক প্রস্তুত

করিবার উদ্দেশ্যে প্রথম নর্ম্ম্যাল স্কুল স্থাপিত হইল। ঐ স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য গবর্ণমেণ্ট একটি প্রতিযোগিতা পরীক্ষার নিয়ম করিলেন। প্রাট্ সাহেবের উপদেশে ভূদেব সেই প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়া ঐ সালের ২২শে জুন তারিখে মাসিক তিনশত টাকা বেতনে হুগলি নর্ম্ম্যাল স্কুলের হেড্ মাষ্টার নিযুক্ত হইয়া গেলেন।

১৮৫৮ খৃঃ অব্দে ভূদেব বাবুর প্রথমা কন্যার বিবাহ হয়। জামাতার নাম তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—নিবাস বারাসত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বছর ইনি বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইঁহারা পণ্ডিতরত্নীমেলের কুলীন। ভূদেব খড়দহ মেলের কুলীন হইলেও মেলভঙ্গ করিয়া কন্যাদান করেন। মেলভঙ্গ বিষয়ে বিশ্বনাথ তর্কভূষণই সম্মতি দিয়াছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক হিন্দু হইলেও সমাজের অকল্যাণকর ব্যবস্থাগুলির সংস্কারে সর্ব্বদাই প্রস্তুত ছিলেন।

এই সময়ে ভূদেব বাবুর প্রথম পুত্র মহেন্দ্রদেব, বার বছরের হইয়া কলিকাতার বাটীতে মারা যায়। ইহার পরে ভূদেব চুঁচুড়ার মাধবীতলায় বাসা করিলেন। পরে ক্রমে ক্রমে চুঁচুড়া বড়বাজারে নিজের অট্টালিকা প্রস্তুত করেন এবং বৃদ্ধ পিতাকে ও পরিবারবর্গকে কলিকাতা হইতে এইখানেই লইয়া আসেন। সেই অবধি তাঁহাদের কলিকাতার বাস উঠিয়া গিয়া উঁহারা চুঁচুড়ার বাসিন্দা হইয়া পড়িলেন।

নর্ম্ম্যাল স্কুলে কার্য্য করিবার সময়ে বর্দ্ধমানের মহারাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুরের সহিত ভূদেবের পরিচয় হইয়া অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল। উহার কিছুদিন পরে তখনকার স্কুল সমূহের ইন্‌স্‌পেক্টার উড্রো সাহেব ছয় মাসের ছুটি লইয়া বিলাতে গেলেন এবং তাঁহার স্থানে অন্য একজন নূতন সাহেব ইন্‌স্পেক্টার নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। কিন্তু তিনি শিক্ষা বিভাগের সম্বন্ধে প্রায় সম্পূর্ণ

অনভিজ্ঞ ছিলেন। তজ্জন্য একজন সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টারের আবশ্যক হইল। ছুটী লইয়া যাইবার সময়ে উড্রো সাহেব নিজে চেষ্টা করিয়া ঐ সহকারী ইন্‌স্পেক্টারের পদ স্থাপিত করাইয়া মাসিক চারিশত টাকা বেতনে ভূদেবকে ঐ পদে নিযুক্ত করাইয়া গেলেন।

তারপরে যিনি ইন্‌স্পেক্টার হইয়া কার্য্য করিতে আসিলেন, তিনি সহকারী ভূদেবের বিদ্যা, জ্ঞান, পাণ্ডিত্য, দূরদর্শিতা, দক্ষতা, পরিশ্রমপটুতা প্রভৃতি অশেষ গুণে মুগ্ধ হইয়া—যাহাতে ভূদেবের ঐ পদ স্থায়ী হয়—তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তখনকার গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারী ইডেন্ সাহেবের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় ছিল—উভয়েই একখানি ইংরাজ পরিচালিত শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে যথারীতি লিখিতেন। ভূদেবকে ইডেন্ সাহেবের সঙ্গে পরিচিত করিবার ইচ্ছায় তিনি ভূদেবকে ঐ সংবাদপত্রে যথারীতি ইংরাজীতে প্রবন্ধ লিখিতে অনুরোধ করিলেন। ভূদেবও সেইরূপ লিখিতে লাগিলেন, এইরূপে ভূদেবের সঙ্গে ইডেন্ সাহেবের পরিচয় হইল। তিনিও ভূদেবের গুণে মুগ্ধ হইয়া গেলেন।

নির্দ্দিষ্ট ছয় মাস অতীত হইয়া গেলেও গভর্ণমেণ্ট সহকারী ইন্‌স্‌পেক্টারের পদ আর উঠাইয়া দিলেন না। বরং ইংরাজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে, এ্যাডিশনাল" (অতিরিক্ত) ইন্‌স্‌পেক্টারের পদ স্থাপিত করিয়া ভূদেবকে সেই পদে নিযুক্ত করিলেন।

এই অতিরিক্ত ইন্‌স্‌পেক্টারের পদ পাইয়া ভূদেব এমন অদ্ভুত কৃতিত্বের সহিত কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, যে সরকার বাহাদুর তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইলেন, এবং তাঁহার বেতনও যথেষ্ট বর্দ্ধিত করিয়া দিলেন। ইহার এক বৎসর পরে ইংরাজী ১৮৬৪ সালে ভূদেব "শিক্ষা-দর্পণ" নামে একখানা উৎকৃষ্ট মাসিক পত্র প্রকাশিত করিয়া দেশশুদ্ধ লোকের পরিচিত এবং অশেষ সম্মান, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পাত্র হইয়া উঠিলেন।

সেই সময়ে তিনি "পুষ্পাঞ্জলি" নামে একখানি উৎকৃষ্ট গদ্য পুস্তকও রচনা করিলেন।

বাঙ্গালীর কার্য্যদক্ষতা এবং জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে সাহেবদিগের যে ধারণা ছিল, ভূদেবের কার্য্যগুলি দেখিয়া তাঁহাদের সে ধারণা দূরে গেল। বাঙ্গালী যে পত্রিকা পরিচালনে অনুপযুক্ত পাত্র নহে—তাহা শিক্ষাদর্পণের প্রবন্ধ ও পরিচালনা প্রভৃতি দেখিয়া সরকার বাহাদুর বুঝিতে পারিলেন এবং অবশেষে ইংরাজী ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে—সরকারী বাঙ্গলা সংবাদ পত্র—যাহা ভূদেবের উপদেশে সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল—সেই এডুকেশন গেজেটের সম্পূর্ণ স্বত্ব, সম্পাদকতা এবং পরিচালনার ভার ভূদেবের হস্তে অর্পিত হইল। তখন হইতে আজি পর্য্যন্ত সেই এডুকেশন গেজেট তাঁহার সুযোগ্য বংশধরগণের হস্তেই রহিয়াছে।

এলাহাবাদ হাই কোর্টের জজ প্রমদাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর বামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত ভূদেব বাবু নিজের দ্বিতীয় কন্যার বিবাহ দেন। বামাচরণ বাবু হাইকোর্টে ওকালতী করিতেন। ইঁহারা ফুলিয়া মেলের কুলীন। ভূদেব এখানেও মেল ভাঙ্গিয়া কন্যার বিবাহ দিয়াছিলেন। তৃতীয় জামাতা শিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এম্-এ; তিনিও ফুলিয়া মেলের কুলীন ছিলেন।

ইংরাজী ১৮৬৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এডুকেশন গেজেটের ভার ভূদেবের হস্তে আসিবার মাসকতক পরেই কলেরায় তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র সিদ্ধেশ্বরের মৃত্যু হয়। এই পুত্রের পীড়ার সময়ে এ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসায় অত্যন্ত অহিত করিয়াছিল বলিয়া ইহার পর হইতেই ভূদেব হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার পক্ষপাতী হইয়া উঠেন এবং নিজে উহা উত্তমরূপে শিখিয়া দেশের লোকের যে কত উপকার করিয়া গিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না।

উত্তর পশ্চিম ও পাঞ্জাব প্রদেশের পাঠশালার শিক্ষাপরিদর্শন

করিয়া রিপোর্ট করিবার জন্য ভূদেব ১৮৬৯ সালে তথায় প্রেরিত হন। ঐ কার্য্য সুশৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিয়া তিনি এমন সুযুক্তিপূর্ণ রিপোর্ট দেন যে, শুধু বাঙ্গালা বা ভারত সরকার নহে—বিলাতের ভারতসচিব পর্য্যন্ত তাহা গ্রাহ্য করেন। তাহারই ফলে বঙ্গদেশে শিক্ষাবিষয়ে কর স্থাপনের প্রস্তাব রহিত হইয়া যায়।

পত্নী বিয়োগের পরে ছাব্বিশ বৎসর কাল জীবিত থাকিয়া—পুত্রের অশেষ সৌভাগ্য দেখিয়া ভূদেবের পিতা বিশ্বনাথ তর্কভূষণ মহাশয় বাঙ্গালা ১৮৬৫ সালের ভাদ্রমাসে ৭৩ বৎসর বয়সে সজ্ঞানে গঙ্গাতীরে দেহ ত্যাগ করিলেন। মৃত্যুর আগের দিন তিনি নিজের জপের মালা গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিয়া শেষ যাত্রার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতেও, তাঁহার মৃত্যুর কথা কেহ বুঝিতে পারে নাই। ভূদেব কলিকাতার হরীতকী বাগানের বাটীতে—খুব ধূমধামের সহিত শ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। এই উপলক্ষে ৺কাশীধাম হইতে মিথিলা পর্য্যন্ত স্থানের বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করা হইয়াছিল।

পাঁচবৎসর চলিবার পর—শিক্ষাদর্পণ পত্রিকা উঠিয়া গেল। তখন ভূদেব—যাঁহারা সে পত্রিকার অগ্রিম মূল্য জমা দিয়াছিলেন—তাঁহাদিগকে হিসাব করিয়া সকলের প্রাপ্য অর্থ ডাকযোগে ফেরৎ পাঠাইয়া দেন।

এই সময়ে ভূদেব চতুর্থশ্রেণীর ইন্‌স্‌পেক্টারের পদে উন্নত হইয়া মাসিক ৭৫০৲ বেতন টাকা পাইতেছিলেন।

---

(৮)

ভূদেব ক্রমশঃ প্রথম শ্রেণীর স্কুল ইন্‌স্‌পেক্টার পদে উঠিলেন। তখন তাঁহার মাসিক বেতন হইল দেড়হাজার টাকা। সে সময়ে

বাঙ্গালীর পক্ষে সরকারী চাকরিতে এরূপ মাহিনা পাওয়া, এ দেশের লোকের কাছে স্বপ্নের খেলা বলিয়া মনে হইত।

১৮৭২ খৃঃ অঃ ভূদেবের পত্নীর দেহত্যাগ হয়। ঐ সময়ে তিনিও কিছু অসুস্থ হইয়া পড়েন। সুতরাং ছুটি লইয়া আসাম, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি বেড়াইয়া আসেন।

১৮৭৭ সালে তিনি পাটনা, ভাগলপুর, বৰ্দ্ধমান ও উড়িষ্যা বিভাগের স্কুল সমূহের ভার পান। তিনি সহকারী ইন্‌স্পেক্টরদিগের সহায়তায় ঐ গুরুতর কাৰ্য্য অতিশয় দক্ষতার সহিত নিৰ্ব্বাহিত করেন। এই সময়ে গভর্ণমেণ্ট গুণের পুরস্কার স্বরূপ ভূদেবকে সি, আই, ই উপাধিতে ভূষিত করেন।

আল্‌ফ্রেড্ ক্রফট্ বাহাদুর এ সময়ে শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর ছিলেন। তিনি অসুস্থ হইয়া তিন মাসের ছুটি লইতে চাহেন। ঐ সময়ে শিক্ষাবিভাগে ভূদেব অপেক্ষা অভিজ্ঞ লোক আর কেহ ছিলেন না বলিলেই হয়। বিশেষতঃ তিনি তখন মাসিক দেড় হাজার টাকা বেতনে প্রথম শ্রেণীর ইন্‌স্পেক্টরের কাজ করিতেছিলেন। সুতরাং ভূদেবই ডিরেক্টরের পদে অস্থায়ীভাবে কাজ করিবেন বলিয়া প্রস্তাব হয়। ইহাতে ইউরোপীয় ইন্‌স্‌পেক্টর ও কলেজের কোন কোন অধ্যক্ষ ডিরেক্টর সাহেবকে ছুটি লইতে নিষেধ করেন। কেহ কেহ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন "স্বজাতীয়দিগকে এদেশীয় লোকের অধীন করিয়া স্বাস্থ্য লাভ করা অপেক্ষা মরণই শ্রেয়ঃ।" স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয় ইংরেজ ক্রফট্ সাহেব এই কথার পর আর ছুটি লইলেন না।

ভূদেব বাবুর ঐকান্তিক চেষ্টায় বিহারের আদালত হইতে পারশী উঠিয়া তাহার স্থানে হিন্দি ভাষা ও নাগরী অক্ষরের প্রচলন হয়। ফলে অতি অল্প কাল মধ্যেই হিন্দী ভাষা অতিশয় উন্নতিলাভ করিয়াছে।

ইহার পর ভূদেব ১৮৮২ খৃঃ অঃ ছোটলাট সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নিযুক্ত হইলেন। এদেশের সম্বন্ধে কোন কিছু করিতে হইলে সরকার বাহাদুর তাঁহার মত গ্রহণ না করিয়া সে কার্য্য করেন নাই। এমন কি স্বয়ং ছোটলাট বাহাদুর ভূদেবকে তাঁহার বেলভিডিয়ার বাটীতে সসম্মানে আহ্বানপূর্ব্বক লইয়া গিয়া নিজে তাঁহার সঙ্গে বন্ধুর মত কথাবার্ত্তা এবং পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেন। এইরূপে সদাশয় ছোট লাট বিডন সাহেবের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বের ভাব স্থাপিত হইয়া গিয়াছিল। ইহা বাঙ্গালীর পক্ষে কম সৌভাগ্য—কম গৌরবের কথা নহে।

দেশের সকলের এমন শ্রদ্ধাভাজন, সম্মানভাজন, প্রীতিভাজন হইয়া এবং মাসিক দেড়হাজার টাকা বেতন পাইয়াও একদিনের জন্য ভূদেব মনে অহঙ্কার বা চপলতাকে প্রবেশ করিতে দেন নাই। অথচ তিনি যে উন্নত ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন—সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেবের মত পিতার সন্তান ছিলেন, সে কথা একদিনের জন্যও ভুলেন নাই। বিশেষতঃ কত কষ্টে বাল্যকালে লেখাপড়া শিখিয়া এমন হইতে পারিয়াছেন তাহাও সর্ব্বদাই তাঁহার মনের ভিতর জাগিত। সেই জন্য মুহূর্ত্তের ভ্রমেও কখন আত্মসম্মান হারান নাই, উগ্রভাব প্রকাশ করেন নাই, ধর্ম্মাচার এবং দেশাচার হইতে স্খলিত হন নাই।

সর্ব্বদাই তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া নানা দেশের স্কুল পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতে হইত। সুতরাং তিনি দেশের নানাস্থানের গ্রাম নগর সকল স্বচক্ষে দেখিয়া দেশবাসীর অবস্থা সহজে বুঝিতে এবং তাহাদের মঙ্গলের জন্য গবর্ণমেণ্টের দ্বারা হিতকর কার্য্য সকল সম্পন্ন করাইবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করিতেন। দেশের হিতেই তাঁহার সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়া দিয়াছিলেন। তাহাতে নিজের বিন্দুমাত্র স্বার্থের গন্ধও ছিল না বলিয়া সকলে তাঁহাকে দেবতা ভাবিয়া অকপটে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করিত।

নানাব্যাপারে ভূদেবকে সর্ব্বদাই বড় বড় সাহেব সুবোদের সঙ্গে মিশিতে হইত। কিন্তু একদিনের জন্যও কাহারও উপরোধে পড়িয়া তিনি তাঁহাদের সঙ্গে কোন প্রকার আহার বা জলগ্রহণ পর্য্যন্ত করেন নাই। এমন কি স্বয়ং ছোটলাট বিডন্ বাহাদুর একদিন ভূদেবকে বেলভেডিয়ারে জল খাইয়া যাইতে বিশেষ অনুরোধ করিলেও তিনি এমন

ভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন যে, তাহাতে অসন্তুষ্ট হওয়া দূরে থাকুক, ছোটলাট বাহাদুর তাঁহার হিন্দুয়ানী এবং আচার রক্ষায় অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি সমধিক শ্রদ্ধাবান হইয়া উঠিয়াছিলেন।

অন্যদিকে তিনি আবার এমনি উদার ও মহানুভব ছিলেন যে, তাঁহার গৃহে মুসলমান আসিলেও তিনি তাঁহাকে সম্যক্ প্রকারে সৎকার এবং সমাদর না করিয়া কিছুতেই ছাড়িতেন না। সর্ব্বদাই পুত্রগণকে কহিতেন যে, গৃহে যিনিই আসুন না কেন—তিনি নারায়ণ। যে জাতিই হউক—অতিথি-নারায়ণের সেবায় বা স্পর্শে দোষ নাই, কিন্তু সেই অতিথি-নারায়ণের প্রতি ঘৃণা বা অবজ্ঞা করিলে মহাপাপ হইয়া থাকে।

একবার এক প্রতিবেশী মৌলবী সাহেব গড়গড়া হাতে লইয়া তামাক খাইতে খাইতে ভূদেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে আসেন। ভূদেবের বৈঠকখানায় টেবিলের উপর গড়গড়া রাখিয়া মৌলবী সাহেব তাঁহার সহিত কথা কহিতে কহিতে অন্যমনস্কভাবে বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর চলিয়া যাইবার সময়ে ভূদেব আপন পুত্রের দ্বারা তাঁহার গড়গড়া আনাইয়া তাঁহার হস্তে প্রদান করিলেন।

পুত্রদিগকে কেবল এই ভাবে যে তিনি অতিথির সেবা শিখাইতেন তাহা নহে। যাহাতে কাহারো উপর কোনপ্রকার বিদ্বেষ বা অবজ্ঞার ভাব তাহাদের মনে স্থান না পায় সেজন্য তিনি সর্ব্বদা বিশেষ সতর্ক থাকিতেন। কাহারো প্রতি কোনপ্রকার অবজ্ঞা প্রকাশ করিতে দেখিলে তিনি ছেলেদিগকে তাহাদের গুণের কথা স্মরণ করাইয়া—ঐরূপ অন্যায় কার্য্য হইতে তাহাদের মন ফিরাইয়া দিতেন।

একবার তিনি আফিসে বসিয়া কাজ করিতেছিলেন, এমন সময় শুনিলেন, তাহার একটী ছেলে—খেলিতে খেলিতে বলিতেছে "বাঙ্গাল মনুষ্য নয় উড়ে এক জন্তু"। ভূদেব শুনিবামাত্র ছেলেকে ডাকিয়া আনিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"স্কুলে তোমরা ইতিহাস পড়িয়াছ?" ছেলে বলিল "হাঁ পড়িয়াছি।" "বলত মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করেন কবে?" ছেলে উত্তর করিলে—তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা মুসলমানেরা পূর্ব্ববাঙ্গালা জয় করেন কবে? উড়িষ্যা জয় করেন কবে?" পুত্র সে দুই প্রশ্নেরও উত্তর দিলে দেখা গেল যে বাঙ্গালা জয়ের প্রায় একশত বৎসর পর পূর্ব্ববঙ্গ এবং তাহার বহুবৎসর পর

উড়িষ্যায় মুসলমান অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল। তখন ভূদেব বাবু বলিলেন "তোমাদের স্বাধীনতা গেলেও যাহারা শতবৎসর স্বাধীনতা রাখিতে পারিয়াছিলেন—তাঁহারা মানুষ নহেন? আর তাঁহাদের চেয়েও বেশি সময় যাঁহারা স্বাধীনতা রাখিয়াছিলেন তাহারা জন্তু? কে তোমায় এমন কথা শিখাইয়াছে?" ছেলেটী নীরব হইল—প্রকৃত ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া—এমন শিক্ষা হইল যে—আর কখনও কাহারো বিষয়ে দ্বেষ বা অবজ্ঞা প্রকাশ করিত না।

ভূদেব সমুদ্র পথে রেঙ্গুন, মাদ্রাজ, বোম্বাই, কলম্বো, প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন এবং ষ্টীমারে এদিকে কামরূপ-কামাখ্যা এবং অপর দিকে চাঁদাবালি দিয়া শ্রীক্ষেত্র পর্য্যন্ত গমন করিয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি জাহাজের উপরে পাচক ব্রাহ্মণকে দিয়া রাঁধাইয়া আহার করিতেন। কেহ কোন প্রকার উপহাস করিলে তৎক্ষণাৎ বলিতেন—"হিন্দু-শাস্ত্র এমন উদারতাহীন নহে, যে জাহাজের উপরে খাইলে জাত যাইবে। যাহারা আমাদের সকল শাস্ত্রের গূঢ়-মর্ম্ম অবগত নহে, তাহারাই নিজ নিজ মত অনুযায়ী হিন্দু-ধর্ম্মকে অমন ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে আবদ্ধ মনে করে।"

গঙ্গাজলের উপর ভূদেবের অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা চিরকাল ছিল এবং তাঁহার ঐকান্তিক বাসনা ছিল যে, গঙ্গাগর্ভে প্রাণত্যাগ করিবেন। এইরূপ জাহাজ বা নৌকাযোগে বিদেশ ভ্রমণকালে তিনি কিছু গঙ্গাজল এবং গঙ্গামৃত্তিকা সর্ব্বদাই সঙ্গে সঙ্গে লইয়া চলিতেন।

ভূদেব মাসে মাসে অত টাকা উপার্জ্জন করিয়াও চিরকাল অত্যন্ত মিতব্যয়িতার সহিত চলিতেন, কোন প্রকার বৃথা বা বাহ্য আড়ম্বর তাঁহার মোটেই ছিল না। তাঁহার চরিত্র সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলঙ্ক, হৃদয় অত্যন্ত উদার, দেশবাসীর প্রতি ঐকান্তিক সম্মান ও অনুরাগ, মনে আর্য্য ঋষিদের প্রাচীন রীতি-নীতি আচার ব্যবহারের প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণ এবং পিতামাতার প্রতি অশেষ ভক্তি শ্রদ্ধা ও সম্মান ছিল। এমন পিতৃবৎসল মাতৃভক্ত উচ্চশিক্ষিত সন্তান অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

১৮৮৩ খৃঃ অঃ জুলাই মাসে চৌত্রিশ বৎসর সরকারী কার্য্য করার পর তিনি অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি

৺কাশীধামে যাইয়া কিছু কাল বাস করেন। কাশীধামের সুপ্রসিদ্ধ ভাস্করানন্দ স্বামী ভূদেবকে অতিশয় স্নেহ করিতেন এবং "পিতা" বা· গ্না সম্বোধন করিতেন।

কিছুদিন কাশী বাসের পর তিনি চুঁচুড়ায় ফিরিয়া আসেন। ১৮৮৯ সালের ১৭ই এপ্রিল তিনি চুঁচুড়ার বাটীতে পিতার নামে "বিশ্বনাথ চতুষ্পাঠী" স্থাপন করেন। মাতা ব্রহ্মময়ী দেবীর স্মৃতিরক্ষার্থ "ব্রহ্মময়ী ভেষজালয়" নামে একটী কবিরাজী ও হোমিওপ্যাথিক ঔষধালয় স্থাপন করিলেন। ১৮৯৪ খৃঃ ৬ই জানুয়ারী তিনি "বিশ্বনাথ ফণ্ড" নামে একটী ধনভাণ্ডার স্থাপন করিয়া ১ লক্ষ ৬০ হাজার টাকা দান করেন। এই ফণ্ড হইতে ঐ চতুষ্পাঠী ও ঔষধালয়ের ব্যয় এবং বহু ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে বার্ষিক ৫০ টাকা বৃত্তি দেওয়া হয়।

"ব্রহ্মময়ী দাতব্য ঔষধালয়" হইতে দেশের শত শত অনাথ, আতুর, দরিদ্র সন্তান আজ পর্য্যন্ত প্রত্যহ বিনাব্যয়ে চিকিৎসিত হইতেছেন এবং ঔষধ পাইতেছেন। এই কার্য্যে ভূদেব দেশবাসীর হৃদয়ে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। আজ পর্য্যন্ত কোন চাকরীজীবী এত বড় দানের ব্যবস্থা করে নাই।

এ সকল ছাড়াও তাঁহার দানের অন্ত ছিল না। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং স্কুলের ছাত্রদের সর্ব্বদাই তিনি মুক্ত হস্তে দান করিতেন। কত দরিদ্র যে তাঁহার প্রদত্ত অর্থে লেখাপড়া শিখিয়া সংসারে মানুষ হইয়া উঠিয়াছে তাহার গণনা হয় না। তদ্ভিন্ন গৃহে অনেকগুলি ঠাকুরের ধাতু মূর্ত্তি এবং নারায়ণ শিলা প্রতিষ্ঠিত আছে, তাঁহাদেরও নিত্যসেবা হইয়া থাকে এবং তাহা হইতে বিস্তর লোক প্রত্যহ অন্ন পাইয়া বাঁচিয়া যাইতেছে।

এইরূপে সংসারে দশকর্ম্মবান হইয়া প্রকৃত কর্ম্মবীর ভূদেব ৭০ বৎসর বয়সে ইংরাজী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ১৬ই মে বাঙ্গলা ১৩০১ সালে বৈশাখী শুক্লা একাদশীতে চুঁচুড়ায় গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে ভগবানের নাম লইতে লইতে মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। ধন্য ভূদেব! যত কাল দেশে ইতিহাস থাকিবে ততকাল তোমার নামও অমর হইয়া দেশবাসীর হৃদয়ে উজ্জ্বল থাকিবে।

সম্পূর্ণ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্‌এর

সচিত্র শিশুপাঠ্য পুস্তকাবলী—

আহ্লাদে আটখানা	... ।✓০	বালক শ্রীকৃষ্ণ	... ॥✓০
ছড়া ও গল্প	... ।৵০	নল দময়ন্তী	... ১॥০
খোকার দপ্তর ১ম	... ।✓০	হাসন হোসেন	... ॥০
ঐ ২য়	... ।৵০	দক্ষিণাত্যে শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য	... ৸০
মোহনভোগ	... ॥✓০	ঠাকুর হরিদাস	... ১৲
খোকার হাসি	... ।০	প্রহ্লাদ	... ॥০
খোকাবাবুর কথ	.. ।✓০	অর্জ্জুন	... ॥৵০
সীতা	... ॥✓০	ভীষ্ম	... ॥০
দময়ন্তী	... ।৵০	শর্ম্মিষ্ঠা	... ।৵০
হাসির জাহাজ	... ।৵০	গোরকিশোর	... ।✓০
ছেলে মহল	... ।৵০	প্রতাপসিংহ	... ।৵০
পৃথিবীর আশ্চর্য্য	... ॥০	দু' অবতার	... ॥০
একলব্য	... ।✓০	শিয়াল পণ্ডিত	... ।০
শৈব্যা	... ।৵০	খুল্লনা	... ।৵০
সতী	... ।৵০	ধ্রুব	... ।✓০
বেহুলা	... ।৵০	বুদ্ধ	... ॥০
ঠাকুরমার ঝোলা	... ১।০	পুরীর চিঠি	... ১৲
সংযুক্তা	... ।৵০	বিদুর	... ।৵০
বামনের দেশ	... ॥০	সরল ও সংক্ষিপ্ত রামায়ণ	... ১৲
দৈত্যপুরী	... ॥০	হজরত মহম্মদ	... ॥০
দগোবার্ট	... ৸০	রাবেয়া	... ।০
সিন্ধবাদ	... ৸০	ভারত নারী সাধারণ সং	... ১॥০
সাবিত্রী	... ।৵০	ঐ রাজ সং	... ২৲
চিন্তা	... ।৵০	সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জ	... ।৵০

তিন আনা সংস্করণ কল্পতরু গ্রন্থাবলী

১। বিদ্যাসাগর
২। মাইকেল মধুসূদন
৩। বঙ্কিমচন্দ্র
৪। রাজা রামমোহন রায়
৫। কেশবচন্দ্র
৬। ঠাকুর রামকৃষ্ণ
৭। নেপোলিয়ান
৮। রমেশচন্দ্র দত্ত
৯। রামদুলাল সরকার
১০। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
১১। কৃষ্ণদাস পাল
১২। হাজি মহম্মদ মহসীন
১৩। আনন্দমোহন বসু
১৪। জর্জ্জ ওয়াসিংটন
১৫। প্যারীচরণ সরকার
১৬। লর্ড কিচ্‌নার
১৭। বিবেকানন্দ
১৮। ভূদেব
১৯। জেম্‌সেদ্‌জী টাটা
২০। গোখ্‌লে
২১। দ্বিজেন্দ্র লাল
২২। হেমচন্দ্র
২৩। ডেভিড্ হেয়ার্
২৪। রামতনু লাহিড়ী

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
ময়মনসিংহ লাইব্রেরী, ময়মনসিংহ

ভট্টাচার্য্য এণ্ড সন্
৬৫ নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা